বিশেষ সংখ্যা

মার্চ ২০২০ ▪ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

শেখ মুজিব আমার পিতা

যেদিন থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দর্শন

অমর একুশে গ্রন্থমেলা: প্রাণের মেলা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

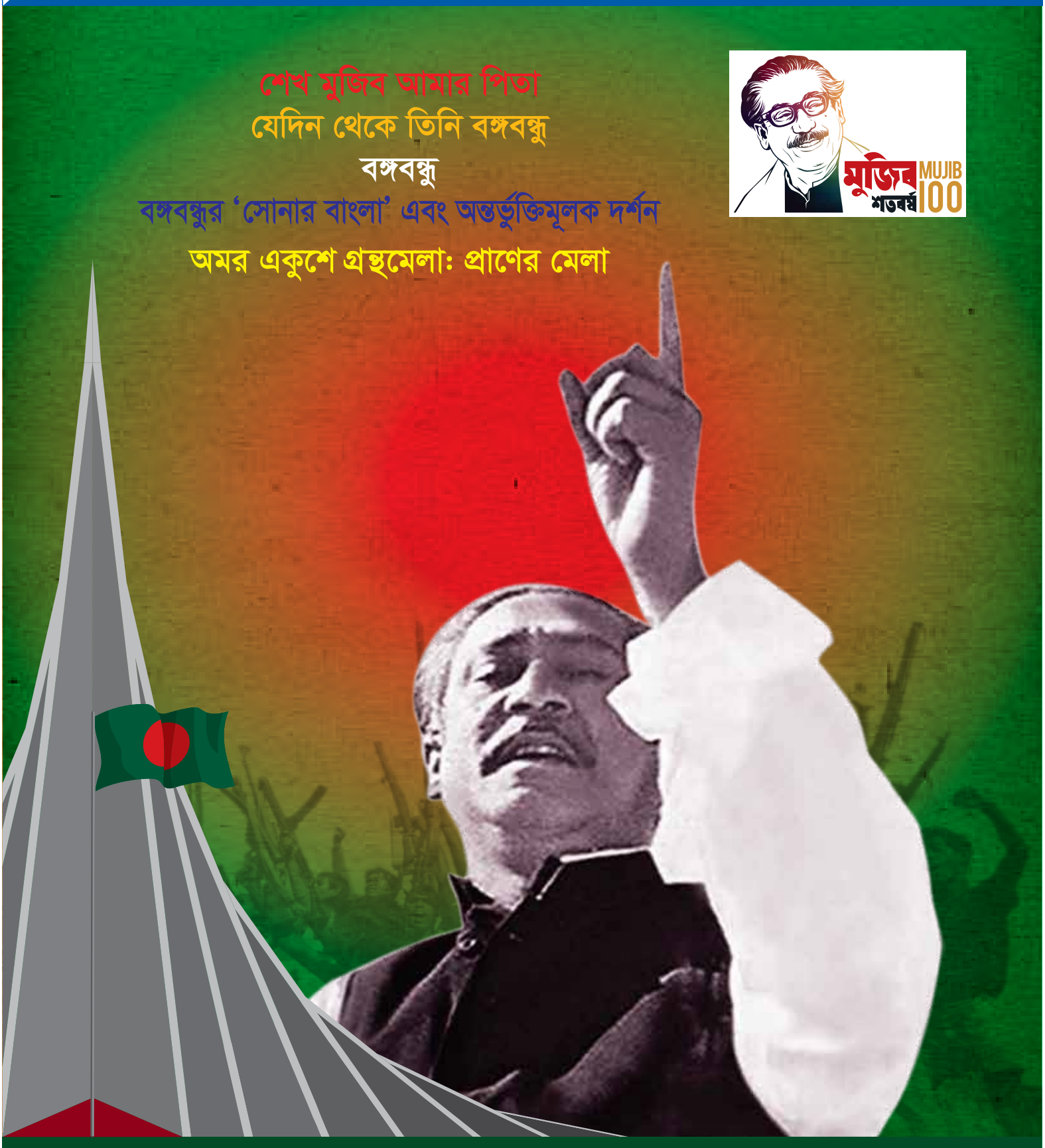

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

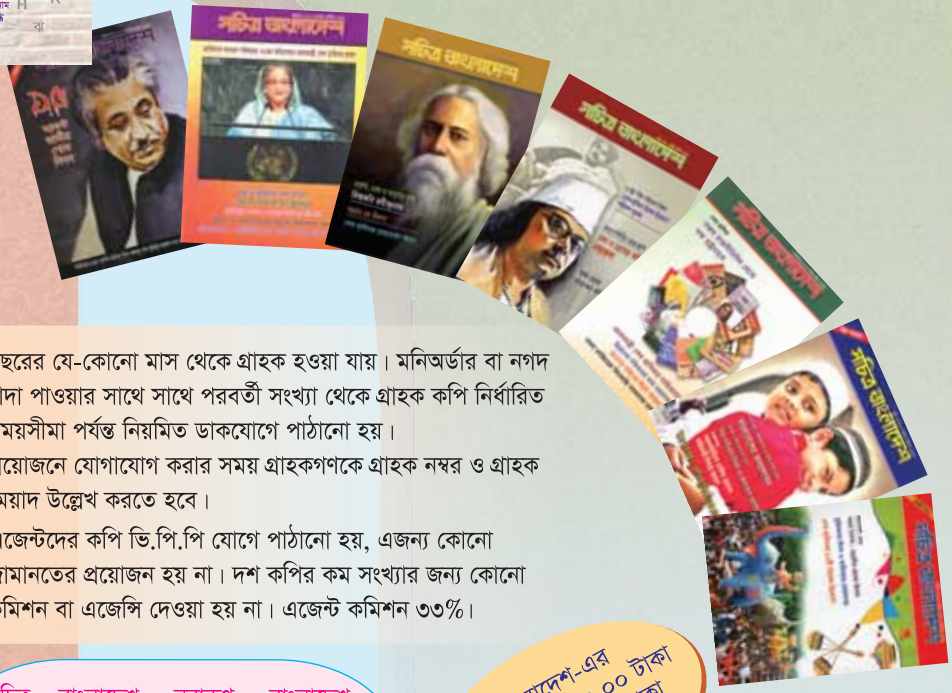

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মার্চ ২০২০ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৬

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর-এর সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি

সম্পাদকীয়

মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অমূল্য মাস। এ মাসেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ মাসেই ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) শাসন-শোষণ করেছিল। বৈষম্যমূলক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণে বন্দি ছিল বাঙালি জাতি। এই বৈষম্যের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সদা সচেতন। তাই তিনি পাকিস্তান সরকারের 'ফেডারেল কন্ট্রোল অব ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাক্ট'-এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর আশঙ্কা– এই আইনের মাধ্যমে শিল্প খাতের নিয়ন্ত্রণ প্রাদেশিক সরকারের হাত থেকে কেন্দ্রে চলে যাবে। ফলে অর্থনৈতিক শোষণ আরো বৃদ্ধি পাবে। মহাকাব্যের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান, তিনি আমাদের জাতির পিতা। বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। ২০২০ সালের জন্মদিনে তাঁর শতবর্ষ পূরণ হবে। তিনি শতবর্ষের মহানায়ক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির মধ্যরাতের সূর্যতাপস।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মুজিববর্ষ পালন করছি। ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে মুজিববর্ষ পালিত হবে। বঙ্গবন্ধু আমাদের সাথেই থাকবেন মহীরুহ হয়ে। শতবর্ষের আলোয় বঙ্গবন্ধু আজ নক্ষত্ররাজ। আমরা তাঁর দীপ্ত আলোয় উদ্ভাসিত। তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আরাধ্য পুরুষ।

১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয় দেশব্যাপী। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। এছাড়াও কবিতা, গল্প, অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ দিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশের* সংখ্যাটি। আশা করি, মার্চ সংখ্যাটি সবারই ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
মহাঃ শামসুজ্জামান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ ৫
শেখ মুজিব আমার পিতা ৭
শেখ হাসিনা
যেদিন থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু ১০
তোফায়েল আহমেদ
বঙ্গবন্ধু ১৩
আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী
বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শন ১৪
ড. আতিউর রহমান
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ ১৭
ড. মোহাম্মদ হাননান
মুজিববর্ষ: শতবর্ষের মহাপুরুষ বঙ্গবন্ধু ২৫
খালেক বিন জয়েনউদদীন
মহৎপ্রাণ মনীষীর জীবন ও সংগ্রাম ২৭
শাফিকুর রাহী
বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ২৯
মুহাম্মদ ইসমাঈল
মুজিববর্ষে পরিচ্ছন্ন গ্রাম–পরিচ্ছন্ন শহর ৩৭
ড. শিল্পী ভদ্র
কলকাতা পুস্তকমেলা থেকে ফিরে ৩৮
সুফিয়া বেগম
সাক্ষাৎকার
মনীষীর কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু: উদ্যোক্তা ভাবনা ৪১
এম এ খালেক
যে ভাষণে অনুরণিত স্বাধীনতা সংগ্রাম ৪৪
কে সি বি তপু
বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ইতিহাস ৪৬
মোহাম্মদ খালিদ হোসেন
বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন সংগ্রামের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ৪৮
আলী হাসান
কৃষকবান্ধব বঙ্গবন্ধুর পথেই নিহিত আগামীর সমৃদ্ধি ৪৯
মোহাতার হোসেন
মুজিব কোট ৫১
শ্যামল কুমার সরকার
অমর একুশে গ্রন্থমেলা: প্রাণের মেলা ৫২
রেহানা শাহনাজ

হাইলাইটস

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ৫৭
ইভা রহমান

বই মানুষের পরম বন্ধু ৫৯
শিউলি শারমিন আহমেদ

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ৬০
সুষমা ফাল্গুনী

গল্প

ঋতুস্নান ৩৩
সেলিনা হোসেন

কবিতাগুচ্ছ ৪০, ৫৪, ৫৫, ৫৬
জসীমউদ্‌দীন, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজ
রোকসানা গুলশান, খান আসাদুজ্জামান
মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ, সাঈদ তপু, সাঈদ হোসেন
আলী মামুদ, সেঁজুতি রহমান, রুস্তম আলী
আবিদ হোসেন, গোবিন্দলাল সরকার

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬১
প্রধানমন্ত্রী ৬২
তথ্যমন্ত্রী ৬৩
জাতীয় ঘটনা ৬৪
উন্নয়ন ৬৬
আন্তর্জাতিক ৬৬
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬৭
শিক্ষা ৬৮
শিল্প-বাণিজ্য ৬৮
বিনিয়োগ ৬৯
নারী ৬৯
সামাজিক নিরাপত্তা ৭০
কৃষি ৭১
বিদ্যুৎ ৭২
কর্মসংস্থান ৭২
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭৩
নিরাপদ সড়ক ৭৩
যোগাযোগ ৭৪
স্বাস্থ্যকথা ৭৪
মাদক প্রতিরোধ ৭৫
সংস্কৃতি ৭৬
চলচ্চিত্র ৭৬
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৭
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৮
ক্রীড়া ৭৮
শ্রদ্ধাঞ্জলি: না ফেরার দেশে মুভি মোগল জাহাঙ্গীর খান ৮০

শেখ মুজিব আমার পিতা

গোপালগঞ্জের বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম। সে গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া। এ গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। নানা শেখ আবদুল মুজিদ আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা স্মৃতিচারণ করেন– আমার দাদির দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান, আমার আব্বা। আর তাই আমার দাদির বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, 'মা সায়েরা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে নাম জগৎজোড়া খ্যাত হবে'। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন-গ্রামবাসীদের কাছে ছিলেন 'মিয়া ভাই' বলে পরিচিত। গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই হৃদয়বান ও অধিকার সচেতন ছিলেন। তিনি যুক্ত হলেন রাজনীতির সঙ্গে। তিনি বাংলার অধিকার আদায়ে পরিণত হলেন 'বঙ্গবন্ধু'তে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন। যেখানে অনেক অজানা তথ্য ফুটে উঠেছে। 'শেখ মুজিব আমার পিতা' শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৭

যেদিন থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু

১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারির পর থেকে বঙ্গবন্ধুর একান্ত সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তোফায়েল আহমেদ। তাঁর প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যৌবনের ১৩টি মূল্যবান বছর পাকিস্তানের কারাগারে কাটিয়েছেন। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে যে নেতা প্রিয় মাতৃভূমি বাংলার ছবি হৃদয় দিয়ে এঁকেছেন, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, সেই নেতাকে সেদিন জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি শুধু বাঙালি জাতিরই মহান নেতা ছিলেন না, সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'যেদিন থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা–১০

অমর একুশে গ্রন্থমেলা: প্রাণের মেলা

বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ২রা ফেব্রুয়ারি শুরু হয় অমর একুশে গ্রন্থমেলা, প্রাণের মেলা। এ মেলার আয়োজন করে বাংলা একাডেমি। মেলা উদ্‌বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মান আরো উন্নত করে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চায়। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'আমাদের সাহিত্যের আরো অনুবাদ হোক। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী আমাদের সাহিত্যকে জানুক, আমাদের সংস্কৃতিকে জানুক– এটাই আমরা চাই।' গ্রন্থমেলার দ্বার উন্মোচন হতেই বাঁধভাঙা জলোচ্ছ্বাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে অসংখ বইপ্রেমী। অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা মেলার শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রধান নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে। 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা: প্রাণের মেলা' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৫২

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

Declaration of Independence

'THIS MAY BE MY LAST MESSAGE, FROM TODAY BANGLADESH IS INDEPENDENT. I CALL UPON THE PEOPLE OF BANGLADESH WHEREVER YOU MIGHT BE AND WITH WHATEVER YOU HAVE, TO RESIST THE ARMY OF OCCUPATION TO THE LAST. YOUR FIGHT MUST GO ON UNTIL THE LAST SOLDIER OF THE PAKISTAN OCCUPATION ARMY IS EXPELLED FROM THE SOIL OF BANGLADESH AND FINAL VICTORY IS ACHIEVED.'

[Message embodying declaration of Independence sent by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to Chittagong shortly after midnight of 25th March, i.e. early hours of 26th March, 1971 for transmission throughout Bangladesh over the ex-EPR transmitter.]

Source: Bangabandhu Speaks, A Government Publication, 1972 (BGP-71/72-2787F-3M)

স্বাধীনতার ঘোষণা

'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

সূত্র : বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা, ২০১২

৭ই মার্চ ১৯৭১, রমনা রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান –ফাইল ছবি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ

[৭ই মার্চ ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা]

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সাথে আমরা আলোচনা করলাম– আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে– তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু– আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

৭ই মার্চ ১৯৭১, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে রমনা রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার একাংশ –ফাইল ছবি

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল করফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' উইদড্রো করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে– শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো– কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়– হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইন্‌শাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

[এখানে মুদ্রিত ভাষণটি 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান'-এর পঞ্চম তফসিল থেকে সংগৃহীত।]

শেখ মুজিব আমার পিতা

শেখ হাসিনা

বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম। সে গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া। বাইগার নদী এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখার একটি বাইগার নদী। নদীর দুপাশে তাল, তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালি গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে। পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে।

প্রায় দুশ বছর পূর্বে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে গড়ে ওঠে আরো অনেক গ্রাম। সেই দুশ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষরা এসে এই নদীবিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলেন এবং তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। অনাবাদি জমিজমা চাষবাস শুরু করেন এবং গ্রামের বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এই গ্রামটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে গড়ে তোলেন। যাতায়াত ব্যবস্থার প্রথমে শুধু নৌকাই ছিল একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানা স্টিমার ঘাট হিসেবে গড়ে ওঠে। আমাদের পূর্বপুরুষরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জমিজমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালানবাড়ি তৈরি করেন। যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দুটো দালানে বসতি ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দুটোই জ্বালিয়ে দেয় । এই দালানকোঠায় বসবাস শুরু হবার পর ধীরে ধীরে বংশবৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আবদুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এ বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার আব্বা, ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। আমার আব্বার নানা শেখ আবদুল মুজিদ। আমার আব্বার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান, আমার আব্বা। আর তাই আমার দাদির বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, 'মা সায়েরা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে নাম জগৎজোড়া খ্যাত হবে'।

আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠোপথের ধুলোবালি মেখে, বর্ষায় কাদা পানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কীভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা– এসব দেখে। দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোটো ছোটো ছেলেদের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগতো। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তাঁর কথামতো যা বলতেন তাই করত। আবার এগুলো দেখাশোনার ভার দিতেন ছোটোবোন হেলেনের ওপর। এই পোষা পাখি, জীবজন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। মাঝে মাঝে এজন্য ছোটো বোনকে বকাও খেতে হতো। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে, সেই খাল মধুমতী ও বাইপার নদীর সংযোগ রক্ষা করে। এই খালের পাড়েই ছিল বড়ো কাছারি ঘর। আর এই কাছারি ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত, মৌলভি সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। এরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁদের কাছে আমার আব্বা আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শিখতেন।

আমাদের পূর্বপুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূরে। আমার আব্বা এই স্কুলেই প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদি তাঁকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেননি। একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তাঁর এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট! সেই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন।

গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি লেখাপড়া করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুর বদলি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা পড়ালেখা করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর কৈশোরবেলা কাটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদি সবসময় ব্যস্ত থাকতেন কীভাবে তাঁর খোকার শরীর ভালো করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন-গ্রামবাসীদের কাছে ছিলেন 'মিয়া ভাই' বলে পরিচিত। গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। আমার দাদি সবসময় ব্যস্ত থাকতেন খোকার শরীর সুস্থ করে তুলতে। তাই দুধ, ছানা, মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের

ফল, নদীর তাজা মাছ সবসময় খোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমার আব্বা ছোট্টবেলা থেকেই ছিপছিপে পাতলা ছিলেন, তাই দাদির আফসোসেরও সীমা ছিল না যে, কেন তাঁর খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুসনুদুস হয় না। খাবার বেলায় খুব সাধারণত ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ-ভাত-কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুপু ও এক চাচা ছিলেন। এই চার বোনের মধ্যে দুই বোন বড়ো

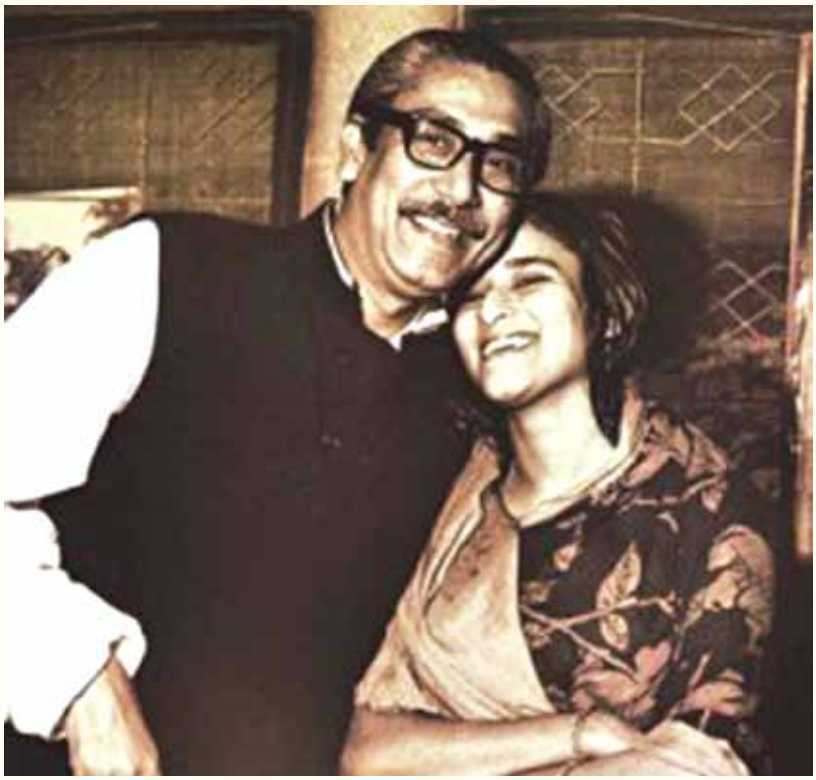

পিতার একান্ত স্নেহে শেখ হাসিনা

ছিলেন। ছোটো ভাইটির যাতে কোনো কষ্ট না হয় এজন্য সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বড়ো দুই বোন। বাকিরা ছোট্ট কিন্তু দাদা-দাদির কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমার দাদার বা দাদির বোনদের ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা পিতৃহারা-মাতৃহারা তাদেরকে দাদা-দাদি নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই প্রায় সতেরো-আঠারোজন ছেলেমেয়ে একইসঙ্গে বড়ো হয়ে ওঠে।

আব্বার যখন দশ বছর বয়স তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মা পিতৃহারা হবার পর তাঁর দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন। আমার খালা মায়ের থেকে তিন-চার বছরের বড়ো। আত্মীয়ের মধ্যে দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে (গার্ডিয়ান) মুরুব্বি করে দেন। আমার মার যখন ছয়-সাত বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে দেন আমার মাকে। আর সেই থেকে একইসঙ্গে সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে তিনি বড়ো হতে থাকেন।

আমার আব্বার লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলতে খুব পছন্দ করতেন। মধুমতী নদী পার হয়ে চিতলমারি ও মোল্লারহাট যেতেন খেলতে। গোপালগঞ্জে স্কুলের টিম ছিল। এদিকে আমার দাদাও খেলতে যেতেন। দাদা আমাদের কাছে গল্প করতেন যে, 'তোমার আব্বা এত রোগা ছিল যে বলে জোরে লাথি মেরে মাঠে গড়িয়ে পড়ত'। আব্বা যদি ধারে-কাছে থাকতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। আমরা তখন সত্যি খুব মজা পেতাম। এর পেছনে মজার ঘটনা হলো মাঝে মাঝে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হতো। এখনও আমি যখন ঐ সমস্ত এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় যারা আব্বার ছোটোবেলার কথা বলেন। আমাদের বাড়িতেই এই খেলার অনেক ফটো ও কাগজ ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ফলে সব শেষ হয়ে যায়।

তিনি ছোটোবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করত। চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেক দূর হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংক পাড়ায়, আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধ ভাত খাওয়ার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো। কারণ আর কিছুই নয়, কোনো ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হতো দেখে, তাকে ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন।

দাদার কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুটির সময় হতো, তখন দাদি আম গাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে, দূর থেকে রাস্তার উপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তাঁর খোকা গায়ে চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে পরনের পাজামা-পাঞ্জাবি নেই। কী ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শতছিন্ন কাপড় দেখে সব দিয়ে এসেছেন।

আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন তখন কোনোদিনই তাঁকে বকাঝকা করতেন না বরং উৎসাহ দিতেন। আমার দাদা ও দাদির এই উদারতার আরো অনেক নজির রয়েছে।

স্কুলে পড়তে পড়তে আব্বার বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখ খারাপ হয়ে যায়। ফলে চার বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকে। তিনি সুস্থ হবার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় আব্বার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হামিদ মাস্টার। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় এবং বহু বছর জেল খাটেন। পরবর্তী পর্যায়ে আব্বা বিভিন্ন সময় যখন জেলে থাকতেন অথবা পুলিশ গ্রেফতার করতে আসত, আমার দাদি মাঝে মাঝে সেই মাস্টার সাহেবের নাম নিতেন আর কাঁদতেন। এমনিতে আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন। ছেলের কোনো কাজে কখনো তাঁরা বাধা দিতেন না, বরং উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আমার আব্বার মনের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কাজ যখনই যেটা ন্যায়সংগত মনে হয়েছে আমার দাদা তা করতে নিষেধ না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন।

আব্বার একজন স্কুল মাস্টার ছোট্ট একটা সংগঠন গড়ে তুলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা, চাল জোগাড় করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। যেখানেই কোনো অন্যায় দেখতেন সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। একবার তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি প্রথম সরকার সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং গ্রেফতার হয়ে কয়েকদিন জেলে থাকেন।

১৯৭২ সালে সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর বামে– বেগম ফজিলাতুন নেছা, শেখ জামাল ও শেখ হাসিনা, ডানে– শেখ রেহানা, শেখ কামাল এবং কোলে শেখ রাসেল

কৈশোরেই তিনি খুব বেশি অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জ সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর মুজিব তাঁর কাছে স্কুলঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন, মেরামত করানোর অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। তখন বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এই সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এই সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়।

১৯৪৬ সালে তিনি বিএ পাস করেন। পাকিস্তান-ভারত ভাগ হবার সময়ে যখন দাঙ্গা হয়, তখন দাঙ্গা দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কাজ করে যেতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমার মেজ ফুপু তখন কলকাতায় থাকতেন। ফুপুর কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে অভুক্ত অবস্থায় হয়ত দুদিন বা তিন দিন কাজ করে গেছেন। মাঝে মাঝে যখন ফুপুর খোঁজখবর নিতে যেতেন তখন ফুপু জোর করে কিছু খাবার খাইয়ে দিতেন। অন্যায়কে তিনি কোনোদিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনো পিছপা হননি।

পাকিস্তান হবার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। অল্প কয়েকদিন পর মুক্তি পান। এই সময়ের পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার কথা ঘোষণা দেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন। আমি তখন খুব ছোট্ট আর আমার ছোটো ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে। আব্বা ওকে দেখারও সুযোগ পাননি।

একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন। সেই সময় আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদির কাছেই থাকতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনো দেখেনি, চেনেও না। আমি যখন বার বার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকছি, ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটি বড়ো পুকুর আছে, যার পাশে আছে বড়ো খোলা মাঠ। ঐ মাঠে আমরা দুই ভাইবোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম। অনেক ফুল-পাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি'। কামালের সেই কথা আজ যখন মনে পড়ে আমি তখন চোখের পানি রাখতে পারি না! আজ ও নেই। আমাদের আব্বা বলে ডাকারও কেউ নেই। ঘাতকের বুলেট শুধু আব্বাকেই ছিনিয়ে নেয়নি; আমার মা, কামাল, জামাল, ছোট্ট রাসেলও রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি কামাল-জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা ও রোজী, যাদের হাতে মেহেদির রং বুকের রক্তের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। খুনিরা এখানেই শেষ করেনি, আমার একমাত্র চাচা শেখ নাসের, তরুণ নেতা, আমার ফুপাতো ভাই শেখ মনি, আমার ছোট্টবেলার খেলার সাথি শেখ মনির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুকে খুন করেছে। এই খুনিরা একইসাথে আক্রমণ করেছে আবদুর রব সেরনিয়াবাত (আমার ফুপা), তাঁর তেরো বছরের কন্যা বেবি, দশ বছরের ছেলে আরিফকে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর চার বছরের শিশু পুত্র বাবুও খুনিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কর্নেল জামিল, যিনি আমার পিতার জীবন রক্ষার জন্য ঘুম থেকে উঠে ছুটে এসেছিলেন– তাঁকেও তারা হত্যা করে। এ কেমন বর্বর নিষ্ঠুরতা? আজও গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে আছেন আমার মেজ ফুপু।

সেদিন কামাল আব্বাকে ডাকার অনুমতি চেয়েছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আব্বার কাছে নিয়ে যাই। আব্বাকে ওর কথা বলি। আব্বা ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করেন। আজ আর তারা কেউই বেঁচে নেই– আজ বারবার আমার মন আব্বাকে ডাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মায়ের স্নেহ, ভাইদের সান্নিধ্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি, কিন্তু শত চিৎকার করলেও তো কাউকে আমি পাব না। কেউ তো আর সাড়া দিতে পারবে না। তাদের জীবন নৃশংসভাবে বুলেট দিয়ে চিরদিনের মতো যে ঘাতকেরা স্তব্ধ করে দিল, তাদের কি বিচার হবে না?

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম গ্রন্থ থেকে, ১৩ই আগস্ট ১৯৯১

লেখক: বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠকন্যা ও প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যেদিন থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু

তোফায়েল আহমেদ

প্রতিবছর ২৩শে ফেব্রুয়ারি যখন ফিরে আসে; স্মৃতির পাতায় অনেক কথা ভেসে ওঠে। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ এই দিনটিকে গভীরভাবে স্মরণ করি। ১৯৬৯-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারির পর থেকে বঙ্গবন্ধুর একান্ত সান্নিধ্য পেয়েছি। প্রিয় নেতা তাঁর যৌবনের ১৩টি মূল্যবান বছর পাকিস্তানের কারাগারে কাটিয়েছেন। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে যে নেতা প্রিয় মাতৃভূমি বাংলার ছবি হৃদয়

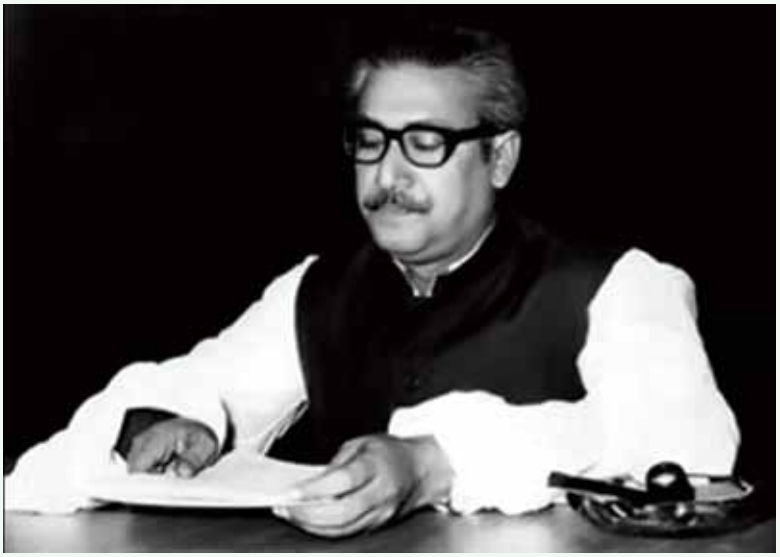

১৯৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ দিচ্ছেন

দিয়ে এঁকেছেন, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, সেই নেতাকে সেদিন জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি শুধু বাঙালি জাতিরই মহান নেতা ছিলেন না, সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেন।

আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কালপর্বটি মহান মুক্তিযুদ্ধের 'ড্রেস রিহার্সেল' হিসেবে চিহ্নিত। জাতির মুক্তিসনদ ৬ দফা দেওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধু মুজিবসহ সর্বমোট ৩৫ জনকে ফাঁসি দেওয়ার লক্ষ্যে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য' তথা আগরতলা মামলার আসামি করা হয় এবং নির্বিঘ্নে পুনরায় ক্ষমতায় আরোহণের এক ঘৃণ্য মনোবাসনা চরিতার্থে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন স্বৈরশাসক আইয়ুব খান। '৬৯-এর ৪ঠা জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডাকসু' কার্যালয়ে ডাকসু ভিপি হিসেবে আমার সভাপতিত্বে এবং সতীর্থ ছাত্র সংগঠন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) ও পরবর্তীকালে এনএসএফ-এর একটি অংশের সমন্বয়ে আমরা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। মত ও পথের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বৈঠকে অনেক তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৬ দফাকে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করে আমরা ১১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করি। আমরা সবাই যার যার সংগঠনের ভিন্নমত ও বক্তব্য ত্যাগ করে এই ঐক্য গড়ে তুলি। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা ছিলেন ছাত্রলীগ সভাপতি আব্দুর রউফ (প্রয়াত) ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী; ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) সভাপতি সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক (প্রয়াত) ও সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা; ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল্লাহ এবং এনএসএফ-এর একাংশের সভাপতি ইব্রাহিম খলিল (প্রয়াত) ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম মুন্সী; ডাকসু জিএস নাজিম কামরান চৌধুরী এবং আমি তোফায়েল আহমেদ ডাকসু ভিপি হিসেবে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক, সমন্বয়ক ও মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করি। আমরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি– প্রতিটি সভায় ডাকসু ভিপি সভাপতিত্ব করবেন, সিদ্ধান্তগুলো ঘোষণা এবং সভা পরিচালনা করবেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাকসু ভিপি ও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি ১১ দফা ঘোষণা করি। এরপর ১৭ই জানুয়ারি যে আন্দোলন আমরা শুরু করি, ২০শে জানুয়ারি শহিদ আসাদের রক্তাক্ত জামা হাতে নিয়ে যে শপথ গ্রহণ করি, ২৪শে জানুয়ারি মতিউর-মকবুল-রুস্তম- আলমগীরের রক্তের মধ্য দিয়ে সেই আন্দোলন সর্বব্যাপী গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে।

৯ই ফেব্রুয়ারি 'শপথ দিবসে' পল্টন ময়দানে সভাপতির ভাষণ শেষে স্লোগান তুলি– 'শপথ নিলাম শপথ নিলাম/ মুজিব তোমায় মুক্ত করব; শপথ নিলাম শপথ নিলাম/ মা-গো তোমায় মুক্ত করব।' ১৫ই ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারি ড. শামসুজ্জোহা নিরাপত্তা বাহিনীর বুলেটে নির্মমভাবে নিহত হলে বাংলার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষুব্ধ মানুষকে দমাতে সরকার সান্ধ্য আইন জারি করে। আমরা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে রাজপথে মিছিল করি এবং ২০ই ফেব্রুয়ারি সমগ্র ঢাকা নগরীকে মশাল আর মিছিলের নগরীতে পরিণত করি। ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবসে পল্টনের মহসমুদ্রে আমরা ১০ ছাত্রনেতা প্রিয় নেতা শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক সবার নিঃশর্ত মুক্তি দাবিতে স্বৈরশাসকের উদ্দেশে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম প্রদান করি। সমগ্র দেশ গণবিস্ফোরণে প্রকম্পিত হয়। জনরোষের ভয়ে ২২শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান আগরতলা মামলা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ সব রাজবন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিলে দেশজুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। প্রিয় নেতাকে কারামুক্ত করার মধ্য দিয়ে শপথ দিবসে প্রদত্ত স্লোগানের প্রথমাংশ 'মুজিব তোমায় মুক্ত করব' এবং ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে প্রিয় মাতৃভূমিকে হানাদারমুক্ত করে স্লোগানের দ্বিতীয়াংশ 'মাগো তোমায় মুক্ত করব' বাস্তবায়ন করেছিলাম। আগরতলা মামলাটি ছিল সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য অগ্নিপরীক্ষার মতো। সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বঙ্গবন্ধু বন্দিদশা থেকে মুক্তমানব হয়ে বেরিয়ে আসেন। মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে পৌঁছে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে আমি ছুটে যাই। বঙ্গবন্ধু অপেক্ষা করছিলেন। ইতোমধ্যে পল্টন ময়দানে লাখ লাখ লোক জমায়েত হয়। তারা ভেবেছিল, বঙ্গবন্ধু পল্টনে যাবেন। বঙ্গবন্ধুকে ৩২ নম্বর থেকে পল্টনে নেওয়ার পথে আমরা সিদ্ধান্ত নিই– না, পল্টনে না। মহান নেতাকে আমরা আগামীকাল ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে গণসংবর্ধনা জ্ঞাপন করব। লাখ লাখ মানুষ প্রিয় নেতাকে একনজর দেখার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে আছে। আকস্মিকভাবে তিনি যদি এখানে আসেন তবে

মানুষ প্রিয় নেতাকে দেখা থেকে বঞ্চিত হবে। তখন বঙ্গবন্ধুকে পল্টনে না নিয়ে বর্তমান যে শিক্ষা ভবন, সেখান থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ হয়ে তাঁকে ৩২ নম্বর বাসভবনে পৌঁছে দিয়ে পল্টনে ছুটে গিয়ে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সব রাজবন্দির উপস্থিতিতে এ সংবাদটি ঘোষণা করি যে, আগামীকাল প্রিয় নেতাকে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে গণসংবর্ধনা প্রদান করা হবে। প্রিয় নেতাকে একনজর দেখবে বলে ৩২ নম্বর শুধু না; সারা ঢাকা শহরের রাজপথে তখন লাখ লাখ মানুষের ঢল।

পরদিন ঐতিহাসিক ২৩শে ফেব্রুয়ারি। শুধু আমার জীবনে না; সমগ্র বাঙালি জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক দিন। কারণ এই দিনটিতে; যে নেতা কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন, বারবার ফাঁসির মঞ্চে গিয়েছেন, সেই প্রিয় নেতাকে আমরা কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিলাম। সেই সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী আমি। সেদিনের সেই রেসকোর্স ময়দানের কথা আজ যখন ভাবি, তখন নিজেরই অবাক লাগে। আমার বয়স তখন ২৫ বছর ৪ মাস ১ দিন। এই অল্প বয়সে বিশাল একটি জনসভার সভাপতি হিসেবে প্রিয় নেতাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে তাঁর আগেই বক্তৃতা করা, এটি আমার জীবনের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অবাক হই এই ভেবে– কী করে এটা সম্ভবপর হয়েছিল! আমি কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি, যারা নেপথ্যে থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে আমাদের পরিচালনা করেছেন। বিশেষ করে আমাকে বলছেন, কোন পয়েন্টে বক্তৃতা করব, কীভাবে বক্তৃতা করব। আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সেদিন ১০ লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ। সেই জনসমুদ্রের মানুষকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে নেতা জীবনের যৌবন কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, সেই প্রিয় নেতাকে কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে একটি উপাধি দিতে চাই। ১০ লাখ মানুষ যখন ২০ লাখ হাত উত্তোলন করেছিল, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। তখনই প্রিয় নেতাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পরবর্তীকালে এই উপাধিটি জনপ্রিয় হয়েছে। জাতির পিতার নামের অংশ হয়েছে এবং আজকে তো শুধু 'বঙ্গবন্ধু' বললেই সারা বিশ্বের মানুষ এক ডাকে চেনে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে মহাত্মা উপাধি দিয়েছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শেরেবাংলা একে ফজলুল হকসহ পৃথিবীর অনেক নেতাই উপাধি পেয়েছেন। কিন্তু ফাঁসির মঞ্চ থেকে মুক্ত হয়ে, গণমানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, ১০ লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এমন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে কেউ উপাধি পাননি। সেদিন আমি বক্তৃতার শেষে বলেছিলাম, আমার বক্তৃতা আর দীর্ঘ করতে চাই না। তখন জনসমুদ্র থেকে রব উঠেছিল, আমি যেন বক্তৃতা শেষ না করি। জনসমুদ্রের প্রবল অনুরোধে আবার বক্তৃতা করে যখন পুনরায় শেষ করতে চাইলাম, তখন সভামঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বলো, বলো, বলো'। তারপর বক্তৃতা শেষে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ঘোষণার পর এই প্রথম নাম ঘোষণা করলাম– এবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন বাংলার মানুষের নয়নের মণি, পৃথিবীর নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে এই প্রথম ভাষণ দিলেন। সে কী ভাষণ! স্মৃতির পাতায় আজও ভেসে ওঠে। এই ভাষণের শেষেই তিনি বলেছিলেন, 'আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে আমাকে গ্রেপ্তার করে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় গ্রেপ্তার করে যখন ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাবে, তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে, ওরা আমাকে ফাঁসি দেবে। তখন এক টুকরো মাটি তুলে নিয়ে কপালে মুছে বলেছিলাম– হে মাটি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাকে যদি ওরা ফাঁসি দেয়, মৃত্যুর পরে আমি যেন তোমার কোলে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকতে পারি।' বক্তৃতার শেষে তিনি বলেছিলেন– 'রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে তোমরা যারা আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছ; যদি কোনোদিন পারি নিজের রক্ত দিয়ে আমি সেই রক্তের ঋণ শোধ করে যাব।' বঙ্গবন্ধু একাই রক্ত দেননি; সপরিবারে বাঙালি জাতির রক্তের ঋণ তিনি শোধ করে গেছেন। তিনি চলে গেছেন, রেখে গেছেন তাঁর দুই কন্যা। ১৯৮১ সালের সম্মেলনে জ্যেষ্ঠ কন্যার হাতে আমরা আওয়ামী লীগের পতাকা তুলে দিয়েছিলাম। স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে ১৯৮১-এর ১৭ই মে তিনি বাংলার মাটি স্পর্শ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দুটি স্বপ্ন ছিল। একটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, যা তিনি সম্পন্ন করেছেন। আরেকটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। সেই কাজটি তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছেন।

তেজগাঁওয়ে শ্রমিক-জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু চলে গেছেন, কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর গৌরবময় অমর কীর্তি। স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে ইসলামিক সম্মেলনে পাকিস্তান সফরের কথা। পাকিস্তানে জেলের মধ্যে যে প্রিজন গভর্নর অর্থাৎ জেল সুপার বঙ্গবন্ধুর দেখাশোনা করতেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলে আমাদের কাছে এসে বলেছিলেন, 'জলের মধ্যে কবর খুঁড়ে কবরের পাশে দাঁড় করিয়েছিলাম তোমাদের নেতাকে। তিনি বলেছিলেন, 'কবরের ভয় আমি পাই না। আমি তো জানি, তোমরা আমাকে ফাঁসি দেবে। কিন্তু আমি এও জানি, যে বাংলার দামাল ছেলেরা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, সেই বাঙালি জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমি জানি, তোমরা আমাকে ফাঁসি দেবে এবং আমি এও জানি– আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই হবে।' বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমার জীবনের সঙ্গে মিশে আছে ১৯৬৮-এর ১৭ই জানুয়ারির কথা। সেদিন আমি ডাকসু'র ভিপি হই। সেই রাতেই বঙ্গবন্ধু স্নেহমাখা এক চিঠিতে আমাকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন, 'জেলের মধ্যে বসে তোর ডাকসু নির্বাচনের খবর শুনে খুবই আনন্দিত হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, এবারের ডাকসু বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে। ওই রাতেই শেষ প্রহরে বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করে

ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। চিঠিতে আমাকে উদ্দেশ করে বঙ্গবন্ধু যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, ডাকসু সত্যিকার অর্থেই সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই দিনটার সঙ্গে আমার জীবন এমনভাবে মিশে আছে যে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই দিনটির কথা আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। ১৯৭২-এর ৮ই জানুয়ারি, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির পর, ৯ই জানুয়ারি লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিল, 'আপনার বাংলাদেশ তো এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেখানে কিছুই নেই, শুধু ধ্বংসস্তূপ।' উত্তরে বলেছিলেন, 'আমার মাটি আছে। আমার মানুষ আছে। আমার মাটি যদি থাকে, আমার মানুষ যদি থাকে, একদিন এই ধ্বংসস্তূপ থেকেই আমি আমার বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শস্য শ্যামলা সোনার বাংলায় পরিণত করব।' জানুয়ারির ১০ তারিখ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১২ই জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৪ই জানুয়ারি মাত্র ২৮ বছর বয়সে আমাকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় রাজনৈতিক সচিব করেন। বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে দেখেছি, কী নিরলস পরিশ্রম তিনি করেছেন! ঘুমানোর আগ পর্যন্ত ছিলেন কর্মমুখর। সময়ানুযায়ী সব কাজ করতেন। ৫টা বললে ৫টা, ৩টা বললে ৩টা। একবার কুষ্টিয়া যাচ্ছেন। আমার সফরসঙ্গী হওয়ার কথা, দু'মিনিট দেরি হয়েছিল। হেলিকপ্টার চলে গেল। কুষ্টিয়া থেকে ফোন করে আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাকে একটা শিক্ষা দিলাম, যাতে কোনোদিন তুমি আর দেরি না করো।' সেই কথাটা আজও মনে আছে। যখন মন্ত্রী ছিলাম, কোনো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গিয়েছি, যারা আয়োজক তাদের আগে গিয়ে বসেছি। কোনোদিন দেরি হয়নি। বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আমার চলার পথে পাথেয় হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে বহু কিছু শিখেছি। যেমন, তিনি অনেককে সাহায্য করতেন। তাঁর ফান্ড আমার হাতে থাকত। তিনি যাকে বলতেন, আমি তাকে টাকা দিতাম। যাকে টাকা দিয়েছি তার নাম খাতায় লিখে রাখতাম। একদিন খাতায় লেখা হিসাব যখন দেখালাম, বঙ্গবন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'এই কি তোমাকে শিক্ষা দিলাম?' বিস্মিত হয়ে উত্তর দিয়েছিলাম, কেন? আমি তো ঠিকই লিখেছি। তখন বলেছিলেন, 'আমি যাকে বিশ্বাস করি, তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি। আমি তোমাকেও বিশ্বাস করি। কিন্তু এটা কী লিখেছ?' পুনরায় বললাম, আমি তো ঠিকই লিখেছি। বললেন, 'না। এই যে, যাকে আমি টাকা দিলাম, তার পুরো নামটাই লিখেছ। তোমার এই খাতাটাই যদি, এই হিসাবটাই যদি অন্যের হাতে পড়ে, তাহলে সে দেখবে আমি কাকে কাকে টাকা দিয়েছি। এটা তো বলা নিষেধ।' তখন তিনি খাতাটা হাতে নিয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে লিখবে, যাতে একজনেরটা আরেকজন না জানে।' কত বড়ো মাপের দয়ালু মানুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু!

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

Certifies the inscription of

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Department of Films and Publications

Dhaka — *Bangladesh*

ON THE MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

30 October 2017

Irina Bokova
Director-General, UNESCO

মনে পড়ে, বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হয়ে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদান করতে আলজেরিয়া গিয়েছিলাম। সে বারের সম্মেলনে জীবিত দুই নেতা আর প্রয়াত চার নেতার নামে তোরণ নির্মিত হয়েছিল। প্রয়াত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, জামাল আব্দুল নাসের, ড. সুকর্ণ এবং কাওমি নক্রুমা আর জীবিত দুজনের একজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং দ্বিতীয়জন মার্শাল যোসেফ ব্রোজ টিটো। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সেদিন দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন–

'বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে শোষক আরেকদিকে শোষিত। আমি শোষিত জনগণের পক্ষে।' সত্যিই তিনি শোষিত জনগণের পক্ষে ছিলেন। জীবনের পাঠশালায় যতটুকু রাজনীতি শিখেছি এবং করেছি; আমার ধারণা, পৃথিবীতে অনেক বড়ো নেতা জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু কোনো নেতার সঙ্গেই বঙ্গবন্ধুর তুলনা হয় না। তুলনা চলে শুধু তাঁর নিজের সঙ্গে। এত বড়ো হৃদয়ের মানুষ, এত বড়ো ভালোবাসার মানুষ, যিনি অপরের দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না। তার শত্রু হলেও তিনি তাকে আপন করে নিতে চাইতেন; কষ্ট দিতে চাইতেন না। এ রকম নেতা পৃথিবীতে জন্মাননি। কোনোদিন জন্মাবেনও না। সেই নেতার সান্নিধ্য লাভ করেছি আমি। মানুষ জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আমারও সময় এসেছে। একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছি; যে গ্রাম ছিল অন্ধকার, লেখাপড়া করতে হতো হারিকেন জ্বালিয়ে, খালি পায়ে স্কুলে যেতে হতো; সেই প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে একটি ছেলে এসে বঙ্গবন্ধুর মতো বিশ্বখ্যাত মহান নেতার সান্নিধ্য লাভ করেছে। আমি সৌভাগ্যবান মানুষ। এর থেকে অধিক চাওয়া-পাওয়ার আমার আর কিছুই নেই। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ১৯৬৯-এর ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে প্রবল গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল, সেই অগ্নিঝরা দিনগুলো: ২০শে জানুয়ারি শহিদ আসাদ দিবস, ২৪শে জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস, ১৫ই ফেব্রুয়ারি শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক দিবস, ১৮ই ফেব্রুয়ারি শহিদ ড. শামসুজ্জোহা দিবস এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু দিবস। স্বাধীন বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় না বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ 'মুজিববর্ষ' পালনের এই শুভলগ্নে জাতির পিতার ঐতিহাসিক অবদান উর্ধ্বে তুলে ধরতেই যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ১৯৬৯-এর ঐতিহাসিক সেই দিনগুলো পালিত হওয়া কাম্য।

আজকের বাংলাদেশ অনেক উন্নতি করেছে, এগিয়েছে। একদা যে বাংলাদেশকে কতিপয় অর্থনীতিবিদ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলতেন, 'বাংলাদেশ হবে দরিদ্র দেশের মডেল। বাংলাদেশ হবে তলাবিহীন ঝুড়ি'; আজ তারাই বলেন, 'বিস্ময়কর উত্থান এই বাংলাদেশের।' গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। দেশের গ্রামগুলো এখন শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। এই যে উত্থান বাংলাদেশের, এর প্রত্যেকটির ভিত্তি বঙ্গবন্ধু স্থাপন করেছেন। আজ যে স্যাটেলাইট মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপিত হয়েছে, বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্‌বোধনের মাধ্যমে সেই কাজটির ভিত্তি তিনি স্থাপন করে গেছেন। সমুদ্রসীমা নির্ধারণের কাজ বঙ্গবন্ধু শুরু করেন। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত চুক্তি বঙ্গবন্ধু করেন। যমুনা সেতু নির্মাণে জাপানের অর্থায়নের জন্য জাপান সরকারের সঙ্গে কথা বলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত ভৈরব ব্রিজ, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পুনর্নির্মাণ করেন। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের স্বীকৃতি আদায় করেন। যখন তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে স্বাভাবিক করলেন, ঠিক তখনই ঘাতকের দল জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করল। আজ তিনি নেই; আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না। কিন্তু এই পৃথিবী যতদিন থাকবে, এই দেশের মাটি ও মানুষ যতদিন থাকবে; দেশের মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অক্ষয় ও অমর হয়ে থাকবেন।

লেখক: আওয়ামী লীগ নেতা, সংসদ সদস্য, সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বঙ্গবন্ধু

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

'প্রায় বারোশ বছর পর বাঙালি জাতির পুনর্জন্ম হয়েছে এবং হাজার বছর পর বাংলাদেশ এমন নেতা পেয়েছে, যিনি রঙে-বর্ণে, ভাষায় এবং জাতি-বিচারে প্রকৃতই একজন খাঁটি বাঙালি। বাংলাদেশের মাটি ও ইতিহাস থেকে তাঁর সৃষ্টি এবং তিনি বাঙালি জাতির স্রষ্টা।'

এ মন্তব্য একজন খ্যাতনামা বিদেশি ঐতিহাসিকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে। খ্যাতনামা ব্রিটিশ সাংবাদিক সিরিল ডানের মতে, 'তিনি সুদর্শন, প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অনলবর্ষী বক্তা এবং শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার মতো ক্ষমতা রাখেন।'

তাঁর জীবনী লেখকদের কেউ কেউ বলেছেন, তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এখন সবচেয়ে বিস্ময়কর ও বহুল আলোচিত নেতা। সামরিক অভ্যুত্থানের যুগেও তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থানের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, গণতন্ত্রের পতনের যুগে গণতন্ত্রকে এশিয়ার একটি দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং 'লৌহমানব' হওয়ার যুগে একচ্ছত্র নায়ক হওয়ার সুযোগ অবহেলা করে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর পদ বেছে নিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, নিরস্ত্র গণমানুষের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে ধাপে ধাপে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পরিণত করে মাত্র নয় মাসে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম সম্ভব করেছেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখটি ছিল তাঁর জীবনের চরম পরীক্ষার দিন। পাকিস্তানের মিলিটারি শাসকচক্রের নায়কেরা এদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অদূরে একদল সশস্ত্র পাকিস্তানি সৈন্য বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু করার নির্দেশ লাভের অপেক্ষায় ছিল। তাদের অজুহাত হতো–শেখ মুজিব ওইদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সভায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং তারা শুধু বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে গেছেন।

আসলে সেদিন সারা বাংলাদেশ ছিল বিদ্রোহী। নব-নির্বাচিত জাতীয় সংসদের বৈঠক ডেকে অকস্মাৎ তা স্থগিত করা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক নায়কদের অনিচ্ছা দেখে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে তখন স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য পাগল। সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত হয়েছিল লাখ লাখ মুক্তিপাগল বাঙালি। তাদের কণ্ঠে ছিল একটিমাত্র দাবি– 'বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ঘোষণা করো। সংগ্রামের নির্দেশ দাও।'

একাত্তরের সাতই মার্চ। বেলা তখন তিনটে। সভামঞ্চে ধীরে ধীরে দেখা দিলেন এশিয়ার সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নেতা। উদ্বেল জনসমুদ্র। অসংখ্য সাংবাদিক চেয়ে আছে তাঁর আজকের সিদ্ধান্তের ওপর। শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

তিনি ধীর ও সংযত ভাষায় বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা নয়, যেন মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্রমুগ্ধ লাখ লাখ মানুষ। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেদিনের সভায় এ ঐতিহাসিক ঘোষণা তাঁর। কিন্তু পাকিস্তানি জঙ্গি শাসকদের অস্ত্র উত্তোলনের সুযোগ তিনি দিলেন না। তাদের পাতা ফাঁদ তিনি ব্যর্থ করে দিলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সেই একই বক্তৃতায় তিনি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমস্যা সমাধানের চারটি প্রস্তাব উল্লেখ করেন। আলাপ-আলোচনার দরজা খোলা রাখলেন।

সেদিন তাঁর সমালোচকরা স্বীকার করলেন, তিনি শুধু রাজনৈতিক দলের নেতা নন, একজন দেশ নায়কও। সংকটের চরম মুহূর্তে তিনি স্থির ও অবিচল থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। বিদেশি সংবাদপত্রে বলা হলো, শেখ মুজিব এখন বাংলাদেশে শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি জাতীয় নেতা। সাড়ে সাত কোটি মানুষ এখন তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। তিনি শিক্ষিত বাঙালির কাছে যেমন প্রিয়, তেমনি প্রিয় অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বাঙালির কাছে। বুদ্ধিজীবী ও কর্মজীবী অর্থাৎ পণ্ডিত ও মজুরের কাছে তিনি সমান প্রেরণা। তিনি রাতারাতি নেতা হননি। কর্মী থেকে নেতা হয়েছেন। নেতা থেকে জাতীয় নেতা। জাতীয় নেতা থেকে জাতির পিতা। এখানেই তাঁর জাদুকরী শক্তির রহস্য, লক্ষ্য ও আদর্শের বিস্ময়কর সাফল্যের মূল কথা। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ। এ সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজনীতিতে এগিয়েছেন। তাদের ভাষায় কথা বলেছেন। তাদের হয়ে সংগ্রাম করেছেন। তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়েছেন। বছরের পর বছর যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো জেলে কাটিয়েছেন। তাই কোটি মানুষের শক্তি তাঁর শক্তি। তিনি তাদের নয়নের মণি। তিনি তাঁর দেশের মানুষের জন্য একাধিকবার হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর দেশের মানুষও তাঁর জন্য অকাতরে আত্মদান করেছে। তাই অতি অল্প সময়ে সফল হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম।

যারা বঙ্গবন্ধুর কাছে একবারও গেছেন তারাই স্বীকার করেছেন, কোমলতা-কঠোরতায় মিশিয়ে অদ্ভুত জাদুকরী আকর্ষণ তাঁর ব্যক্তিত্বে। তিনি শিশুর মতো সরল, সাহসে অনমনীয়, প্রয়োজনে বজ্রের মতো কঠোর, সেই সঙ্গে মিশেছে দুর্জয় মনোবল, নিজের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। তিনি চরিত্রে জাতীয়তাবাদী, স্বভাবে গণতন্ত্রী, বিশ্বাসে সমাজতন্ত্রী এবং আদর্শে ধর্মনিরপেক্ষ। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের তিনি উদ্যোক্তা, বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, অর্থনীতির প্রবক্তা এবং সেই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শের অনুসারী। পশ্চাৎপদ কৃষিনির্ভর সমাজ এবং তার সঙ্গে যুক্ত মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ছিল বাংলাদেশে যে-কোনো ধরনের প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিকাশের পথে প্রবল অন্তরায়। রাজনৈতিক দিক থেকে শাসিত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বহু শতাব্দী ধরে শোসিত একটি এশীয় দেশ– যেখানে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন তখনো দানা বাঁধেনি বরং বেকার জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ বাড়ছে, সেই দেশে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করা এবং তাকে নিজের জীবদ্দশায় সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দেওয়া কম বিস্ময়ের কথা নয়। এজন্য বঙ্গবন্ধুকে দীর্ঘ ২৫ বছর ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়েছে। আন্দোলন করতে হয়েছে। আন্দোলনের কৌশল ও স্লোগান বারবার পালটাতে হয়েছে। তাই বলা চলে বাংলাদেশে স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামকাল মাত্র নয় মাস। কিন্তু পরোক্ষ আন্দোলনের সময়ের পরিধি ২৫ বছর। এ ২৫ বছর কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। ক. গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাংগঠনিক পর্যায়, খ. বিপিসি বা মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, গ. ভাষা আন্দোলন, ঘ. নির্বাচনি মোর্চা গঠন ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ঙ. সামরিক শাসন, চ. সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ছ. স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, জ. ঐতিহাসিক ছয় দফার আন্দোলন, ঝ. নির্বাচনি বিজয় ও অসহযোগ আন্দোলন, ঞ. সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম।

পঁচিশ বছরের এ মুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলনে প্রতিটি পর্যায়ে যুক্ত রয়েছেন শেখ মুজিব। তাই বাংলাদেশ বলতে আজ শেখ মুজিব। শেখ মুজিব বলতে বাংলাদেশ।

লেখক: প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শন

ড. আতিউর রহমান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর লেখনিতে এবং বক্তৃতায় বহুবার 'সোনার বাংলা' শব্দগুচ্ছের উচ্চারণ লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বেশ আগে থেকেই 'সোনার বাংলা' শব্দগুচ্ছ তিনি সাধারণ মানুষের সামনে নিয়ে আসেন। রাজনীতি-অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ ও বিদ্বেষ পেরিয়ে তিনি 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বার বার। তাঁর আহ্বানে এদেশের সাধারণ মানুষরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁদের আত্মত্যাগ ছিল অতুলনীয়, একইসঙ্গে লক্ষ লক্ষ বাঙালি নারীর সামগ্রিক অবদানও ছিল অবিস্মরণীয়।

বঙ্গবন্ধু সব সময়ই 'সোনার বাংলার' গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন এবং সে মতো কাজও করেছেন। 'সোনার বাংলা' তাঁর কাছে নিছক রাজনৈতিক কোনো 'বুলি' ছিল না। এই ভূখণ্ডের অতীত গৌরবের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছিল। তিনি জানতেন মাত্র কয়েক শতাব্দী আগেই বাংলা ছিল সম্পদে ভরপুর সমৃদ্ধ এক ভূখণ্ড। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ, উর্বর জমি এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদনদীর কল্যাণে ব্যাপক কৃষি উৎপাদনের কারণে আমাদের এ ভূখণ্ডটি ছিল বিশ্বখ্যাত। মসলিন, সিল্ক, তুলা, মসলা, এমনকি জাহাজ পর্যন্ত রপ্তানি করার জন্য এই ভূখণ্ডের নামডাক ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। সে যুগে বাংলা ছিল প্রকৃত অর্থেই একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। বঙ্গবন্ধু এই গৌরবময় অতীত সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির যথাযথ সংগ্রামের মাধ্যমে অতীতের সেই গৌরবময় অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর তাই স্বাধীনতার বহু বছর আগেই তিনি তাঁর সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। আর সুযোগ পেলেই জাহিদুর রহিমকে দিয়ে অনেক সমাবেশেই 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' রবীন্দ্র সংগীতটি গাওয়াতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানকে (অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশকে) একটি 'নব্য উপনিবেশ' হিসেবেই দেখতে চাচ্ছিল। জনগণের প্রাণের নেতা এবং খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের একজন মন্ত্রী হিসেবে খুব কাছ থেকে শোষণের এই চিত্রটি তিনি দেখেছিলেন।

অবাস্তব রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই একচোখা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে) ঠকিয়ে গেছে। এই বৈষম্যের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সদা সচেতন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, এই বৈষম্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক মাত্রার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মাত্রাও ছিল। আর তাই সে সময় তিনি পাকিস্তান সরকারের 'ফেডারেল কন্ট্রোল অব ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাক্ট'-এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এই আইনের মাধ্যমে শিল্প খাতের নিয়ন্ত্রণ প্রাদেশিক সরকারকে পাশ কাটিয়ে পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৫০টি বৃহৎ শিল্প ইউনিটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ৪৭টি বৃহৎ শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র ২ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে কৃষির অধিকতর বিকাশের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য বেশি পরিমাণে বরাদ্দ দিচ্ছিল। বাংলাদেশের কৃষকরা অতি উন্নত মানের পাট উৎপাদন করত। অথচ এই পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে যা আয় হতো তার শতকরা ৯০ ভাগই ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি ব্যয় নির্বাহ করার জন্য। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের বৃহৎ শিল্প কারখানাগুলোও তুলে দেওয়া হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্প মালিকদের হাতে।

বঙ্গবন্ধু এই ভয়াবহ বৈষম্যমূলক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এ দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই যখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তখন সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন এ দেশে শিল্পের বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করতে। প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রস্তাবনার সার-সংক্ষেপ এ রকম:

- প্রাদেশিক সরকার আমদানির লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষমতা পাবে।
- পাট, তুলা ও তৈরি পোশাকের মতো শিল্পগুলোর নিয়ন্ত্রণ থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
- আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের একটি কার্যালয় স্থাপিত হবে পূর্ব পাকিস্তানে (অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে)।
- সাপ্লাই এবং ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মহাপরিচালকের একটি পৃথক কার্যালয় পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত হবে।
- শতকরা ৫০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা যাবে পূর্ব পাকিস্তানে (আগে যাচ্ছিল কেবল ১০ ভাগ)।

তাছাড়া, কেন্দ্রীয় চা বোর্ডের সভাপতি হিসেবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক চা শিল্পের বিকাশে তৎপর ছিলেন। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে দরকষাকষিও করেছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবনা অনুসারে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি থেকে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ এ দেশীয় কর্তৃপক্ষের হাতে আসার কথা। পূর্বের প্রতি পশ্চিমের বৈষম্যের সূত্রগুলো খুঁজে বের করার জন্য তিনি একটি অর্থনৈতিক কমিশন গঠনের প্রস্তাবও করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবনা অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ একটি অর্থনৈতিক কমিশন গঠনও করেছিল। ওই কমিশনে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা কাজ করেন এবং বঙ্গবন্ধু যে বৈষম্যের কথা এত দিন বলে আসছিলেন তারই প্রতিধ্বনি করেন। কিন্তু এই কমিশনের প্রতিবেদনটি দ্রুতই হিমাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তা আর আলোর মুখ দেখেনি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কথা রাখেনি। এসবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন বাঙালির স্বাধিকারের লক্ষ্যে দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় জায়গায় ছিল ৬ দফা দাবি। আর এই ৬ দফার মূল কথাই ছিল বৈষম্য দূরীকরণ। এজন্য তাঁকে বার বার জেলে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি সুদৃঢ় ছিলেন। কখনো আপোশ করেননি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এই আন্দোলনের জোরেই শেষ পর্যন্ত

ক্ষমতাচ্যুত হন জেনারেল আইয়ুব খান (তদানীন্তন স্বৈরশাসক)। উনসত্তরের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন মূলত একজন রাজনীতিবিদ তবে অর্থনীতির বিষয়গুলো খুব ভালোভাবেই ধরতে পারতেন। আর তাই তিনিই প্রথম পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অর্থনীতির প্রস্তাবনা হাজির করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন– 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে পনেরোশ মাইলের ব্যবধান তা ভৌগোলিক সত্য। কাজেই এই দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই।' এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অনীহা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন ভগ্ন দশায় থাকা অবকাঠামো, বিধ্বস্ত অর্থনীতি, লাখো ক্ষুধার্ত মানুষ এবং কঠিন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। উল্লেখ্য, শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে আসছিল। তবুও তিনি আশা ছাড়েননি। দেশের দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে আন্তর্জাতিক সহায়তার তিনি বিরোধী ছিলেন না। তবে আত্মসম্মানের বিনিময়ে তা গ্রহণে ছিল তাঁর দারুণ অনীহা। ১৯৭৩ সালে বিশ্ব ব্যাংকের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট পিটার কারগিল এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন– দাতাদের কাছ থেকে সহায়তা না নিলে বাংলাদেশের জনগণ কী খাবে। বঙ্গবন্ধু তখন তাকে তাঁর 'সুগন্ধা' (গণভবন) অফিসের জানালার কাছে গিয়ে বাইরে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন– 'আপনি বাইরে কী দেখতে পাচ্ছেন?' কারগিল বলেছিলেন– 'সবুজ ঘাসের একটি সুন্দর উঠোন'। তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'যদি আপনারা কোনো ধরনের সহায়তা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তবে আমার জনগণ এগুলো খাবে।' এমনি আত্মমর্যাদাশীল এক নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। পরবর্তী সময়ে অবশ্য অনেক শিথীল শর্তে ওই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল। সর্বদাই বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে খুবই আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন তিনি। স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তিতে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন– 'শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলায় আগামী দিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলব। ক্ষেতখামার, কলকারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।' তাছাড়া পরবর্তী সময়ে অন্য আরেকটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন– 'আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক।'

এখান থেকেই বোঝা যায় যে, বঙ্গবন্ধু যথাযথভাবেই কৃষি ও শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষি শুধু যে মানুষের খাবারের যোগান দিবে তাই নয় বরং আরো বহু বছর এ দেশের মানুষের আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে থেকে যাবে। এছাড়া দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি শক্তিশালী কৃষি খাত দেশের বর্ধিষ্ণু শিল্প খাতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জোগান দিবে। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই বঙ্গবন্ধু দেশের কৃষির বিকাশের জন্য বেশ কিছু সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কৃষি ও শিল্প খাতের পারস্পরিক নির্ভরতার বিষয়েও ছিলেন সচেতন। যেমন: সার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ। তাই বঙ্গবন্ধু সারা দেশে সার কারখানা স্থাপন ও সেগুলো চালু করাকে দিয়েছিলেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বঙ্গবন্ধু জানতেন যে শিল্পায়নের কোনো বিকল্প নেই। একদিকে শিল্পায়নের ফলে উৎপাদিত পণ্য দেশের ভেতরের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানি আয় নিশ্চিত করে, অন্যদিকে শিল্প খাতে বর্ধিষ্ণু জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। তবে সম্ভবত সদ্য স্বাধীন দেশে শিল্পায়নই ছিল বঙ্গবন্ধুর সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। কারণ তখন বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল শূন্য, কোনো বিদেশি বিনিয়োগ ছিল না। ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজও ছিল সামান্য। সর্বোপরি খুব অল্প লোকেরই প্রয়োজনীয় উদ্যোক্তাসুলভ দক্ষতা ছিল। আর সে কারণেই শুরুতেই রাষ্ট্রীয় খাতের প্রাধান্য দিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। তবে এ কথা মানতেই হবে যে, বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনা সব সময়ই ছিল উদ্যোক্তাবান্ধব। তাই কীভাবে উদ্যোক্তাদের বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা যায় সেদিকে সব সময় মনযোগ দিয়েছেন। আগেই যেমনটি উল্লেখ করেছি, এমনকি যখন প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন তখনো ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী পরিস্থিতি ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। সে সময় এ দেশে ব্যক্তি খাতের বিকাশের বাস্তবতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে তাই বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্প খাতের বিকাশের যথোপযুক্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সকল পাকিস্তানি উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকরা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর টাকাপয়সা ও অন্যান্য উপকরণ সাথে করে নিয়ে চলে যাওয়ায় স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধু বড়ো বড়ো ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান, পাট ও চিনি কল এবং টেক্সটাইল কারখানা রাষ্ট্রীয়করণ করেছিলেন এবং এর প্রাথমিক ফলাফল ছিল সত্যিই চমকপ্রদ।

প্রাথমিক পর্যায়ে সঙ্গত কারণেই রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে শিল্প বিকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও বঙ্গবন্ধুর মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল ব্যক্তি খাতের বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের জাতীয় বাজেট প্রস্তাবনাগুলোর দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মেলে। যেমন: ১৯৭৪-১৯৭৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ২৫ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকা করা হয় এবং ব্যক্তি খাতের উদ্যোগে শিল্পকারখানা স্থাপনের সুযোগ রাখা হয়। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলেই পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া ১৩৩টি কারখানা ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ফলে বোঝাই যাচ্ছে যে, 'ডিরেগুলেশন'-এর প্রথম পর্যায় শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর আমলেই।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুবিবেচনাভিত্তিক কৃষি ও শিল্প নীতির আলোকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অপশক্তি তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথ থেকে সরে এসেছিলাম। বহু বছর এবং বহু সংগ্রাম ও ত্যাগের পর আমরা আবার তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন অভিযাত্রার পথে আবার ফিরে আসতে পেরেছি। এখন প্রধানমন্ত্রী সামনে থেকে আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং উপর থেকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতির মূল সুর ঠিক করে দিচ্ছেন। তাঁর সহযোগী নেতৃত্ব এবং জনপ্রশাসনের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই মূল লক্ষ্যগুলোকে ছোটো ছোটো বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপে বিভক্ত করে সেগুলোর মানসম্পন্ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। এজন্য আমাদেরকে পদ্মা সেতু, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, বড়ো বড়ো পাওয়ার প্ল্যান্ট, গভীর সমুদ্র বন্দর, মেট্রোরেল, রেলওয়ের উন্নয়ন, নদী পথের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি ই-কমার্স ও এফ-কমার্সের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল অবকাঠামো প্রস্তুত করার

মতো মেগা উদ্যোগগুলো সময় মতো বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। আমাদের শিক্ষিত তরুণদের মাঝে বিরাজমান বেকারত্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন এবং ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরির দিকেও বিশেষ মনযোগ দেওয়া হয়েছে। কৃষির সকল উপখাতে যান্ত্রিকীকরণে নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ।

সর্বোপরি এসডিজিগুলো যথা সময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করা, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা পুরোপুরি নির্মূল করতে এবং একইসঙ্গে সৌরশক্তি ও বায়ু শক্তিসহ সকল ধরনের নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসের যথাযথ প্রয়োগ ও প্রসারের দিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে সরকার। এসডিজি লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি খাত ও অলাভজনক সংস্থগুলোর সম্মিলিত ও সু-সমন্বিত উদ্যোগ উৎসাহিত করা হচ্ছে। চীনে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং সাম্প্রতিক চীন-মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত বিনিয়োগকারীরা চীন থেকে সরে আসছেন তাদেরকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি ভারত, ভুটান, নেপাল ও বাংলাদেশ মিলে বিবিআইএন উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক সহযোগিতা বাড়াতে কানেক্টিভিটির সুযোগগুলো বাড়ানো হচ্ছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য আরো সহজ করা হয়েছে, যাতে 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' সূচকে আমরা আরো উন্নতি করতে পারি। পাশাপাশি, বহুকষ্টে গড়ে তোলা আমাদের সামাজিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে গতি আনতে এবং ব্যাংকিং খাতের ঋণখেলাপি, তারল্য সংকট ও পরিচালনা সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বর্তমান সরকার।

দারিদ্র্য, রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্যের অভাব, জনসম্পদের দক্ষতার ঘাটতির মতো কিছু চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী যে, একটি গতিশীল ও বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির দেশ হিসেবেই আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে পারব। এরই মধ্যে আমাদের সমাজ এবং অর্থনীতিকে আমরা একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পেরেছি। এই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেখিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করতে পারব বলে আশা রাখি। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় আমরা ক্ষণে ক্ষণে এই স্বপ্নের মুখোমুখি হব এবং তার রূপায়নে ব্রতী হব। তবে এ জন্য অবশ্যই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। এই মহাস্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কেবল মাত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই। বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও সমাজ গড়ার যে স্বপ্নের বীজ বঙ্গবন্ধু আমাদের মনে বুনে গেছেন আমরা তার প্রতি সদাই অনুগত থাকব সেই প্রতিজ্ঞাই করছি।

এ কথা সত্য যে, সকল অর্থেই বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ। তিনি আজীবন বাঙালির সার্বিক মুক্তির কথা বলেছেন। বিশেষ করে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। একাত্তরের ৭ই মার্চ তিনি মুক্তি শব্দটি বার বার উচ্চারণ করেছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই এদেশের অগণিত দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষ শহিদ হয়েছেন। তাদের সেই মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন বাংলাদেশের পরিকল্পনার দায়িত্ব পেয়েই তিনি স্বদেশী কায়দায় দেশ পুনর্গঠনে নেমে পড়েন।

কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের কালরাত্রিতে বঙ্গবন্ধুকে পরিবারে হত্যা করা হয়। থেমে যায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সম্ভাবনাময় অভিযাত্রা। পুরো জাতি যে সমতাভিত্তিক সমাজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাঁর অবর্তমানে দেশ চলতে শুরু করে ঠিক তার বিপরীত দিকে। অবশ্য বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আবার সঠিক পথে ফিরেছে। বহু কষ্টে তিনি সারা পৃথিবীর সামনে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে হাজির করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা আশাবাদী যে, 'ডেমোগ্রাফিক' ও 'ডেনসিটি ডিভিডেন্টে'র কল্যাণে বাংলাদেশের এই সাফল্যের ধারা আরো কয়েক দশক ধরে অব্যাহত থাকবে। আর এসব কারণেই বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্পটি এতটা চমকপ্রদ।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে নতুন দেশ হিসেবে আবির্ভাব ঘটে বাংলাদেশের। পরবর্তীতে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হন বঙ্গবন্ধু এবং লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পা রাখেন তাঁর স্বপ্নের ভূমি বাংলাদেশে। এর দুদিন পর তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। সেদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে গেছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে পুনর্গঠনের। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি তাঁর প্রিয় দেশবাসীকে আজীবন স্বপ্ন দেখিয়েছেন সমৃদ্ধ সোনার বাংলার।

মুক্তিযুদ্ধের পর পর দেশ যে একটা বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে রয়েছে তা বঙ্গবন্ধু নিশ্চিতভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু পাশাপাশি অসংখ্য বাধা মোকাবিলা করে সাফল্য পাওয়ার যে সক্ষমতা এ দেশের জনগণের রয়েছে সে সত্যটিও তিনি জানতেন। ১৯৭২ সালে প্রজাতন্ত্রের যে সংবিধান প্রস্তুত করা হয় সেখানেও তাঁর অন্তর্ভুক্তিমূলক সমৃদ্ধির দর্শন প্রতিফলিত হয়। নিঃসন্দেহে তিনি সঠিক পথেই এগুচ্ছিলেন। স্বাধীনতার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার অনেকটাই বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের কল্যাণে যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো এবং সত্যিকার অর্থে কোনো নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান না থাকা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। দেশের ভেতরে ও বাইরে বেশ কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে তখন খাদ্য শস্যের ভয়াবহ সঙ্কট চলছিল। ওই সময়টায় আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যের সঙ্কটের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জও বঙ্গবন্ধুর সরকারকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। আর এগুলো মোকাবিলার জন্য তাঁর হাতে সম্পদও ছিল খুব সীমিত। অল্প দেশজ সম্পদ এবং কিছু আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়েই ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশের অর্থনীতিকে তুলে আনতে পেরেছিলেন। তাঁর শক্তিশালী এবং অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃত্বের গুণে এদেশের মানুষও নিজেদের লড়াই করার শক্তির ওপর আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল।

তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পথে ফিরেছে। তবু আজও ভাবি যদি সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষার বাতিঘর বঙ্গবন্ধুকে অকালে না হারাতাম তাহলে আজ আমরা আরো কতটা পথই না এগিয়ে যেতে পারতাম। তাঁকে হারাবার পর প্রায় ৪৫ বছর পেরিয়ে গেছে। তবু আজও তিনি তাঁর কন্যাদের এবং আমাদেরকে চেতনার জায়গা থেকে সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছেন। নিরন্তর সাহস ও অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন আমাদের বিস্ময়কর উন্নয়ন অভিযাত্রায়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দৃঢ়তার সাথে বলছে– উন্নয়ন থেকে কেউই পিছিয়ে থাকবে না। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় যুক্ত হয়েছে সমাজের সবশ্রেণির মানুষ। বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার সেই স্বপ্ন বুকে ধরেই এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

লেখক: বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ

ড. মোহাম্মদ হাননান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ছাত্রসমাজের সঙ্গে। এই তিনটি ভিন্ন সময়ের বাংলাদেশে ছাত্রসমাজের প্রথম দলটি ছিল ব্রিটিশ আমলের অবিভক্ত বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ; দ্বিতীয় দলটি ১৯৪৭-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ; তৃতীয় দলটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ। কালক্রম অনুযায়ী সাল-তারিখটি খানিকটা এরকম–

১. ১৯৩৫-১৯৪৭: ব্রিটিশ আমলের বঙ্গের ছাত্রসমাজ;

২. ১৯৪৭-১৯৭১: পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ;

৩. ১৯৭২-১৯৭৫: স্বাধীন বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। এই সময় উপমহাদেশ ও সমগ্র বিশ্বে যেসব ঘটনাবলি ঘটেছিল তা ছিল নিম্নরূপ–

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার (১৯১৭) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাহিনি ছড়িয়ে পড়েছে নানান দেশে।

২. ইউরোপের দেশগুলো অহংকার করে নিজেদের 'সভ্য' এবং এর বাইরের দেশগুলোকে 'কম সভ্য' ঘোষণা করেছে।

৩. 'লিগ অব নেশনস' নামে জাতিসমূহের সমিতি গঠিত হয়েছে।

৪. ভারতীয় উপমহাদেশে খেলাফত আন্দোলনের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশদের দমননীতির বিরুদ্ধে এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।

৫. আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৬. তাসখন্দে প্রগতিবাদী মানবেন্দ্র নাথ রায় এবং মুসলিম মুজাহিদদের উদ্যোগে প্রথম ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে।

৭. নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) অফিসার হয়ে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন।

৮. কবি নজরুল *নবযুগ* পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।[১]

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্ম সময়টিতে সমগ্র বিশ্ব এবং ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল টালমাটাল। বঙ্গবন্ধু যখন একজন কিশোর-ছাত্র, তখন তিনি বিশ্ব ও উপমহাদেশের এই পরিস্থিতিতে নিজেও আন্দোলিত। স্মৃতিকথায় বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

> ১৯৩৪ সালে যখন আমি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি তখন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি।... ১৯৩৬ সালে আবার আমার চক্ষু খারাপ হয়ে পড়ে।... এই সময় আমি মাদারীপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম লেখাপড়া করার জন্য। কলকাতা যেয়ে ডাক্তার টি আহমেদ সাহেবকে দেখালাম।...
>
> চোখের চিকিৎসার পর মাদারীপুরে ফিরে এলাম, কোন কাজ নেই। লেখাপড়া নেই, খেলাধুলা নেই, শুধু একটা মাত্র কাজ, বিকালে সভায় যাওয়া। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। মাদারীপুরের পূর্ণদাস তখন ইংরেজের আতঙ্ক। স্বদেশী আন্দোলন তখন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। আমার মনে হত মাদারীপুরে সুভাষ বোসের দলই শক্তিশালী ছিল। পনের-ষোল বছরের ছেলেদের স্বদেশীরা দলে ভেড়াত। আমাকে রোজ সভায় বসে থাকতে দেখে আমার উপর কিছু যুবকের নজর পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধেও আমার মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হল। ইংরেজদের এদেশে থাকার অধিকার নাই। স্বাধীনতা আনতে হবে। আমিও সুভাষ বাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। এই সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া-আসা করতাম। আর স্বদেশী আন্দোলনের লোকদের সাথেই মেলামেশা করতাম।[২]

এখানে কয়েকটি বিষয় বিশেষ করে, যুগপৎ বঙ্গবন্ধুর কৈশোরের ছাত্রজীবনের চিত্র এবং তৎকালীন বঙ্গদেশের ছাত্রসমাজের রাজনীতি-সচেতনতা ভেসে উঠেছে। তাঁর কৈশোর জীবন ১৯৩৪ সালে মাত্র চৌদ্দ বছরে পদার্পণ এবং সপ্তম শ্রেণির ছাত্র; আবার ১৯৩৬ সালে ষোলো বছর বয়সেও চোখের সমস্যার জন্য সপ্তম শ্রেণিরই ছাত্র তিনি। তৎকালীন বঙ্গদেশের একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবে বঙ্গদেশের দুটো রাজনৈতিক ধারাই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। 'স্বাধীনতা আনতে হবে। আমিও সুভাষ বাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম', 'আর স্বদেশী আন্দোলনের লোকদের সাথেই মেলামেশা করতাম'। বঙ্গদেশের ছাত্র হিসেবে দুটো বিষয়ই তাঁর সামনে চলে এসেছে, একটি সুভাষ বাবু, আরেকটি স্বদেশী আন্দোলন।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বিশ শতকের ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকে বঙ্গদেশের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন। বিশেষ করে বাংলার তরুণ ও ছাত্রসমাজে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৮ সালে যখন 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' সংগঠন গড়ে তুললেন তখন সারা বাংলায় ছাত্র-যুবা-তরুণ সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। পরে ১৯৩৯ সালে ফরোয়ার্ড ব্লক নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন নেতাজি। বাংলার অন্যান্য ছাত্রসমাজের মতো বঙ্গবন্ধুকেও তা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

আর ১৯০৫ সাল থেকে শুরু হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন। বিদেশি পণ্য, বিশেষ করে ইংরেজদের পণ্য বর্জন করে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেবে ভাই' গান সমগ্র বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কলকাতার বাইরে রংপুর, নোয়াখালী এবং বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। দীর্ঘদিন এ আন্দোলন গ্রামবাংলার তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। তরুণ-কিশোর ছাত্র হলেও বঙ্গবন্ধু এ আন্দোলনেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। এসব আন্দোলনের সভায় তিনি মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে নিয়মিত যাতায়াত করেছিলেন। প্রশাসন থেকে এজন্য বঙ্গবন্ধুর অভিভাবকদের সতর্কও করা হয়েছিল।[৩]

বাংলাদেশের মুসলিম ছাত্রদের তখন একমাত্র সংগঠন ছিল নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ। বঙ্গবন্ধু তখন একেবারেই কিশোর এবং একটি মফস্বল শহরের বাসিন্দা। কিন্তু মুসলিম ছাত্রদের সংগঠনের খবর তাঁর কাছে ছিল। গোপালগঞ্জ সফর করতে আসা অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুজিবকে প্রশ্ন করলেন– 'তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই'? মুজিব উত্তর দিলেন– 'কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। মুসলিম ছাত্রলীগও নাই'।[৪]

তিনি যে পরবর্তীকালে বাংলার মুসলিম ছাত্রদের নেতৃত্ব দেবেন– এ কথোপকথন তারই একটা সূত্র (Clue) হয়ে উঠল। মাত্র দু'বছর পরই ১৯৩৯ সালে মুজিব কলকাতা গেলেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করে বললেন– 'গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করব এবং মুসলিম লীগও গঠন করব'।[৫] বঙ্গবন্ধু এরপর স্মৃতিকথায় লিখেছেন–

> খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেব এমএলএ তখন মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন। তিনি সভাপতি হলেন ছাত্রলীগের। আমি হলাম সম্পাদক। মুসলিম লীগ গঠন হল। একজন মোক্তার সাহেব সেক্রেটারি হলেন, অবশ্য আমিই কাজ করতাম। মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটি এটা গঠন করা হল। আমাকে তার সেক্রেটারি করা হল। আমি আস্তে আস্তে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করলাম।[৬]

বঙ্গবন্ধু যুগপৎ ছাত্র রাজনীতি এবং মূল রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। আর এ ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, তখন রাজনৈতিক নেতারাও ছাত্র সংগঠনে থাকতে পারতেন, তা না হলে খন্দকার শামসুদ্দীন আহমদ এলএলএ (সে সময়ের সংসদ সদস্য) হয়েও কেমন করে জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি হলেন!

বঙ্গবন্ধু লিখেছেন– তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে আর নজর নাই। শুধু মুসলিম লীগ, আর ছাত্রলীগ।... মুসলিম লীগ বললেই গোপালগঞ্জে আমাকে বোঝাত। ছাত্র রাজনীতির কথা এখানেই শেষ নয়। শেরে বাংলা ফজলুল হকের সঙ্গে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বন্দ্ব শুরু হলে ফজলুল হক, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাথে আঁতাত করে বাংলায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু মুসলিম ছাত্ররা তা ভালোভাবে নিতে পারেনি। ফলে মুসিলম লীগ ও ছাত্রকর্মীরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল। আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম'।[৭] বঙ্গবন্ধু তখন কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র এবং বেকার হোস্টেলে থাকেন। বোঝা যাচ্ছে, ছাত্র রাজনীতি আর দলীয় রাজনীতি একাকার হয়ে পড়ছে।

ছাত্র রাজনীতি যারা করছিলেন তারা পদ-মোহে লালায়িত ছিলেন। দল-উপদল ও নানা গ্রুপ ছিল। একবার ক্ষমতা পেলে আর ছাড়তে চাইতেন না। বঙ্গবন্ধুর মোহহীন পর্যবেক্ষণ:

> ছাত্রদের মধ্যে দুইটা দল ছিল। চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরীও তখন ছাত্র আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন। ওয়াসেক সাহেব ও ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে গোলমাল লেগেই ছিল। ওয়াসেক সাহেব ছাত্রদের রাজনৈতিক পিতা ছিলেন বললে অন্যায় হবে না। বহুদিন তিনি অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। ছাত্রজীবন শেষ করেছেন বোধ হয় পনের বছর পূর্বে। তবুও তিনি পদ ছাড়বেন না।[৮]

কিন্তু আমরা দেখেছি, সে আমলে বঙ্গবন্ধু নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান, নিজেই একা একটি সংগঠন। বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শেষ থেকে চল্লিশ দশক পর্যন্ত তিনি কলকাতায় বঙ্গের ছাত্র রাজনীতির ছিলেন প্রাণ। বঙ্গবন্ধু বলেছেন–

> এই সময় ইসলামিয়া কলেজে আমি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি। অফিসিয়াল ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে তাদের পরাজিত করলাম। ইসলামিয়া কলেজই ছিল বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। পরের বছরও ১৯৪৩ সালে ইলেকশনে আনোয়ার সাহেবের অফিসিয়াল ছাত্রলীগ পরাজিত হল। তারপর আর তিন বৎসর কেউই আমার মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ইলেকশন করে নাই। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ইলেকশন হত। আমি ছাত্র নেতাদের নিয়ে আলোচনা করে যাদের ঠিক করে দিতাম তারাই নমিনেশন দাখিল করত, আর কেউ করত না। কারণ জানত, আমার মতের বিরুদ্ধে কারও জিতবার সম্ভাবনা ছিল না।[৯]

উপরিউক্ত ভাষ্যে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির তৎকালীন একটি চিত্র ভেসে উঠেছে, যাতে বোঝা যায়, মুসলিম ছাত্রলীগের কমিটি ও নেতৃত্ব ছিল কাগজে-কলমে, তাদের বিশেষ সক্রিয়তা ছিল না। বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের মধ্যে কাজ করতেন, আর তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও যে ছিল তা নির্বাচন পরিস্থিতিতে বোঝা যায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু অফিসিয়াল প্যানেলের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখলেও ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই নির্বাচনের প্রার্থী ঠিক করে দিতেন। এটা বঙ্গবন্ধুর একটি নিজস্ব রাজনৈতিক শৈলী, যেখানে একনায়কতন্ত্র নয়, বরং সকলের মত নিয়েই 'অফিসিয়াল' প্যানেলের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। বাংলার ছাত্র রাজনীতিকে এভাবে বঙ্গবন্ধু প্রথম থেকেই আগলে রেখেছিলেন। কারণ 'অফিসিয়াল' প্যানেলে যারা থাকত, সেসব ছাত্রনেতারা ছিলেন মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের অনুসারী। বঙ্গবন্ধু সেই ব্রিটিশ আমলেই লক্ষ করেছিলেন, পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয়েছিল যে মুসলিম লীগের মাধ্যমে, সে মুসলিম লীগ ছিল প্রথমত 'কাগজে-পত্রে'; এর অর্থ কাজ-কামে এরা জনগণের সঙ্গে নেই। কিন্তু যে বিষয়টা তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল সেটা হলো, একদল লোক মুসলিম লীগের নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে আছেন, যাদের সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পর্কই নেই। বঙ্গবন্ধু চাচ্ছিলেন মুসলিম লীগ জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোক–

> এইসময় (১৯৪৩- লেখক) থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে দুইটা দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটা প্রগতিবাদী দল, আর একটা প্রতিক্রিয়াশীল। শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই, জনগণের প্রতিষ্ঠান করতে চাই। মুসলিম লীগ তখন পর্যন্ত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই। জমিদার, জোতদার ও খান বাহাদুর নবাবদের প্রতিষ্ঠান ছিল। কাউকেই লীগে (মুসলিম লীগে-লেখক) আসতে দিত না। জেলায় জেলায় খান বাহাদুরের দলেরাই লীগকে পকেটে করে রেখেছিল।[১০]

বাংলার মুসলিম ছাত্র রাজনীতিও মুসলিম লীগের এ প্রতিক্রিয়াশীল পকেট সংগঠন হয়ে পরিচালিত হয়ে আসছিল। বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করেছেন বাংলার মুসলিম ছাত্র রাজনীতিকে এ বলয় থেকে বের করে নিয়ে আসতে। মুসলিম লীগ নিজেই 'তখন পর্যন্ত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত' হয়নি। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ঢাকার এক খাজা বংশের থেকেই এগারোজন এমএলএ (সংসদ সদস্য– লেখক)-কে নির্বাচিত করে নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দীন যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন তাঁর ছোটো ভাই খাজা শাহাবুদ্দীনকেও মন্ত্রী করা হয়েছিল। পাকিস্তান জন্মের পূর্বেই দল ও সরকারে পারিবারিক প্রভাব বড়ো করে দেখা দিয়েছিল। তাঁদের পারিবারিক প্রভাবকে অক্ষুণ্ন রাখতে তারা মুসলিম ছাত্রদের রাজনীতিও সেভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতেন, সেরকম ধামাধরা ছাত্রনেতাদের বেছেও নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অনুসারী মুসলিম ছাত্রদের সামনে তখন দুর্ভিক্ষ

মোকাবিলা করার কর্মসূচিই বড়ো হয়ে উঠেছিল, কারণ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু ছাত্র রাজনীতিকে তখন কীভাবে ব্যবহার করেছেন তার একটি বিবরণ বঙ্গবন্ধু নিজেই দিয়েছেন–

> দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই।... ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে।... ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।... এমন দিন নাই রাস্তায় লোক মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। আমরা কয়েকজন ছাত্র শহীদ সাহেবের কাছে যেয়ে বললাম, 'কিছুতেই জনসাধারণকে বাঁচাতে পারবেন না, মিছামিছি বদনাম নেবেন'। তিনি বললেন, 'দেখি চেষ্টা করে কিছু করা যায় কি না, কিছু লোক তো বাঁচাতে চেষ্টা করব'।[১১]

এ উল্লেখ থেকে একটি বিষয় উঠে আসছে যে, তৎকালীন ছাত্র রাজনীতি ছিল প্রধানভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন- সংগ্রাম করার একটি মঞ্চ মাত্র। যদিও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও তৎকালীন ছাত্র রাজনীতি অবদান রাখছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দেখি, ছাত্র রাজনীতিকে কাজে লাগাচ্ছেন দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায়। ছাত্র ব্রিগেড চলে যাচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ক্যাম্প করছে, খাবার জোগাচ্ছে ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত। ছাত্র রাজনীতির এটি ছিল একটি নতুন উপাদান। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতে এ ধারা বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

তবে তৎকালীন ঢাকা কেন্দ্রীক ছাত্র রাজনীতিতে আমরা এ ধরনের কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে দেখতে পাই না। এর একটি বিশেষ কারণ বোধহয় এ হবে যে, এখানে কোনো শেখ মুজিবুর রহমান ছিল না, গোপালগঞ্জের শেখ মুজিব ছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি, বিশেষ করে মুসলিম ছাত্র রাজনীতিতে তিনি নতুন অবয়ব ও গতি দান করেছিলেন।

অবশ্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ঢাকার রাজনীতিও এ সময় পর্যন্ত ততটা সরগরম ছিল না। কারণ কলকাতা মহানগরী হওয়ায় সারা ভারতের তো বটেই, সারা বিশ্বের নতুন চিন্তাধারাও অনুপ্রবেশ ঘটার বেশ সম্ভাবনা ছিল এবং ঘটেছেও তাই। কিন্তু ব্রিটিশ যুগের ঢাকা শহরে তা খুবই সহজ ছিল না। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের একটা বড়ো অংশ আধুনিক অগ্রগামী চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সাধারণভাবে অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তি ও জনসাধারণ ছিল মূলত স্থিতাবস্থায় পক্ষপাতী এবং এটা এই অঞ্চলের পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বাভাবিকও ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রকাশ্য রাজনীতির ছোঁয়া যতটুকু ছিল তা হলো সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। আর নির্বাচনটুকুও হতো আঞ্চলিকতাকে পুঁজি করে। যে জেলার ছাত্র বেশি থাকত সাধারণত সে থেকেই সংসদের সহসভাপতি পদে বিজয় লাভ ঘটত। তবে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতার একটা বড়ো মাপকাঠি ছিল মেধাবী ছাত্র হওয়া। সংগঠনমূলক রাজনৈতিক চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিকে প্রথম সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন ছাত্রনেতা ফজলুর রহমান।[১২]

ঢাকার মুসলমান ছাত্রসমাজ সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনার মানে এতবেশি পিছিয়ে ছিল যে, এখানে তখন পর্যন্ত বৃহত্তম আন্দোলন দাঁড় করানোর কথা ভাবা যেত না। মুসলিম ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেকের নেতৃত্বে কলকাতার মুসলমান ছাত্ররা ১৯৩৬ সালে শ্রী-পদ্ম মনোগ্রাম এবং বন্দে-মাতরম সংগীতের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করে তাতে শত চেষ্টা করেও ঢাকার মুসলমান ছাত্রদের যুক্ত করতে উদ্যোক্তারা ব্যর্থ হন। স্থানীয়ভাবে ঢাকার হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলেও ত্রিশের দশক পর্যন্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তা ছড়ায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দাঙ্গায় অংশ নিত না।[১৩]

তবে মুসলমান-প্রধান ছাত্রসমাজের প্রভাবিত ঢাকা অপেক্ষাকৃত সরগরম হয়ে ওঠে ১৯৪০-এর পর থেকে। এর মধ্যে ১৯৪০-এর মার্চে মুসলিম লীগের সম্মেলনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' পাস হয়ে গেছে। আর ব্যাপারটি ধীরে ধীরে হলেও মুসলমান ছাত্রদের আকৃষ্ট করেছিল বেশ প্রবলভাবেই। পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলমান

ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান মুসলিম ছাত্রলীগ খুব ভালোভাবেই জড়িয়ে পড়েছিল এবং আন্দোলনে সমর্থন জোগাচ্ছিল। ঢাকার ছাত্ররাও (মুসলিম ছাত্ররা) আন্দোলনে সাড়া দেয়:

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রগণ বোধহয় এই প্রথম দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক মঞ্চের ঘটনা-দুর্ঘটনা, দাবি-প্রতিবাদীর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে। তারা আন্দোলিত হচ্ছে তার দ্বারা।[১৪]

বঙ্গদেশে তখন শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা ক্ষমতায়। অর্থাৎ এ কে ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বাধীন অংশটি তখন সরকার গঠন করেছিল। ফজলুল হকের সঙ্গে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর তীব্র বিরোধ চলছিল তখন মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অঙ্গনে। ফলে ঢাকায় ফজলুল হক সমর্থক ও বিরোধী উভয় গোষ্ঠীরই অস্তিত্ব ছিল। তাই ঢাকা মুসলিম ছাত্রসমাজও স্বাভাবিকভাবে ছিল দ্বিধাবিভক্ত। তবে মুসলমান ছাত্রদের প্রধান অংশ হক সাহেবের বিরোধী গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। এই সময় হক সাহেবের ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে মুসলমান ছাত্রদের মধ্য তীব্র মতানৈক্য এবং হানাহানির কয়েকটি ঘটনা ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হল (শহীদুল্লাহ হল) ও ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসগুলোতে ছাত্র সংঘর্ষ হয়। ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে ফজলুল হককে কালো পতাকা প্রদর্শন করাকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল

হকের মধ্যে নানা রকম বৈপরীত্য থাকলেও বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে একটি ইতিবাচক ধারণা ছিল। কলকাতায় বঙ্গবন্ধু শেরে বাংলার এরকম আচরণ লক্ষ করলেও বঙ্গবন্ধুর পিতা বঙ্গবন্ধুকে শেরে বাংলার বিরুদ্ধে না যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তা উল্লিখিত হতে দেখি।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তান অংশে ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে ঢাকায় প্রথমেই বঙ্গবন্ধু যে বিষয়টি লক্ষ করলেন তাহলো, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নতুন কোনো কমিটি হলো না। বরং ১৯৪৭ সালে পূর্ব কলকাতাকেন্দ্রিক নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের জাতীয় কমিটি ঢাকায় তার কার্যালয়টুকু মাত্র স্থানান্তর করল। শুধুমাত্র 'নিখিল বঙ্গ' স্থানে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান' বসিয়ে পূর্বের কমিটিই বহাল হয়ে গেল। ১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনই ছিল অবিভক্ত বঙ্গের মুসলিম ছাত্রলীগের শেষ সম্মেলন। এতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী ও শাহ আজিজুর রহমান।

কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর এই সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে চরম কোন্দলের সৃষ্টি হয়। বিরোধীরা সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় কালক্ষেপণ করতে থাকে। ইতোমধ্যে পাকিস্তানে ভাষা প্রশ্নের বিতর্কও শুরু হয়ে যায়। এই ঘটনাগুলো ঘটতে যাচ্ছিল সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের মাত্র তিন-চার মাসের মধ্যেই। ভাষা প্রশ্নে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এক ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করতে থাকলে সংগঠনের বিদ্রোহী অংশ শুধুমাত্র 'নিখিল' শব্দটি বাদ দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নামে একটি ভিন্ন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি এই বিদ্রোহী ছাত্রলীগের অস্থায়ী সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল মিলনায়তনে নাজমুল করিমের সভাপতিত্বে বিদ্রোহী ছাত্রলীগ কর্মীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নঈমুদ্দিন আহমদ (রাজশাহী) কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক এবং অলি আহাদ ঢাকা শহর শাখার ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। তবে পুনর্গঠিত কাজের এই নয়া আন্দোলন ছাত্রলীগ গঠনে মূল উদ্যোগ গ্রহণ করেন ছাত্ররাজনীতি থেকে প্রায় বিদায় গ্রহণকারী ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। সে জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই নতুন ছাত্রলীগের স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে নঈমুদ্দিন আহমদ উপদলীয় কোন্দলের শিকার হয়ে বহিষ্কৃত হন এবং ওই বছরই সেপ্টেম্বরে (১৯৪৯-১৯৫০) সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় দবিরুল ইসলাম ও খালেক নেওয়াজ খানকে। নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নামে একটি সংগঠন থাকা সত্ত্বেও কেন নতুন আরেকটি ছাত্র প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেওয়া হচ্ছে, সে কারণ ব্যাখ্যা করে বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে 'পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আবেদন' শীর্ষক এক বিজ্ঞপ্তিমূলক দলিল ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে প্রচার করা হয়। তাতে বলা হয়–

> ... ৩. চারি বৎসর পূর্বে গঠিত ছাত্রলীগের কর্ম পরিষদের সদস্যদের প্রায় সকলেই ছাত্রজীবনের অবসান হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির মানসে তাঁহারা গদি আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছেন।...
>
> ৬. বর্তমান অদ্ভুত জরুরি সমস্যাগুলির সমাধান করিতে কর্মকর্তারা লজ্জাহীন নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এবং নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে উল্লিখিত হয়–

> মন্ত্রিসভা বা বিরোধীদলের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি হওয়া আমাদের নীতি নয়... সরকারের জনকল্যাণকর কর্মপদ্ধতির প্রতি আমাদের সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতি থাকিবে কিন্তু সরকারের জন ও ছাত্র স্বার্থ বিরোধী কর্মপন্থাকে আমরা রুখিয়া দাঁড়াইব।... এবং ইসলামি ভাবধারায় শিক্ষাপ্রসারের জন্য আমাদের এই প্রস্তাবিত নব প্রতিষ্ঠান কাজ করিয়া যাইবে।[১৫]

যারা এই প্রচারপত্র প্রকাশ করেন, সেইসব ছাত্রনেতা পূর্বেই ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি বিকেলে ফজলুল হক হল মিলনায়তনে একটি বিশেষ ছাত্রসভা ডেকেছিলেন। জনাব নাজমুল করিম (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর) এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভাতেই সংগঠনের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' রাখা হয়।

সাবেক ছাত্রনেতা অলি আহাদ দাবি করেছেন যে, ফজলুল হক হলের ছাত্রলীগের এই পুনর্গঠন সভার মূল উদ্যোক্তা তিনিই ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখছি নঈমুদ্দিন আহমদ নতুনভাবে পুনর্গঠিত এই ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নির্বাচিত হলে অলি আহাদ ঢাকা শহরে ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। অলি আহাদ মূল উদ্যোক্তা হলে তিনিই কেন্দ্রীয় নেতা হতেন, কিন্তু তিনি হলেন ঢাকা শহরের নেতা। অলি আহাদ পুনর্গঠিত এই নতুন ধারার ছাত্রলীগের সাথে তেমন আর আদর্শিক সম্পর্কও রাখেননি। এদিক থেকে বরং শেখ মুজিব এগিয়ে ছিলেন। তিনি নতুন ধারায় ছাত্রলীগকে এগিয়ে নিতে প্রধান প্রেরণদাতা হিসেবে কাজ করতে থাকেন।

পুনর্গঠিত ছাত্রলীগের শুধু নতুন কমিটি হলো না, নতুনভাবে আদর্শায়িতও হলো এই ছাত্রলীগ। দলের নামে 'মুসলিম' শব্দটি থাকলেও ছাত্রলীগের এই অংশের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। ফলে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাথে এর উত্তরাধিকার ঐতিহ্য থাকল না, নতুনভাবেই ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি কার্যত ভিন্ন একটি ছাত্রলীগই জন্ম নেয়।

সেদিনের ছাত্রলীগের এই পুনর্জন্মের লগ্নে যেসব ছাত্রনেতা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন–

১. নঈমুদ্দিন আহমদ, রাজশাহী
২. শেখ মুজিবুর রহমান, ফরিদপুর
৩. আবদুর রহমান চৌধুরী, বরিশাল
৪. অলি আহাদ, কুমিল্লা
৫. আজিজ আহমেদ, নোয়াখালী
৬. আবদুল মতিন, পাবনা
৭. দবিরুল ইসলাম, দিনাজপুর,
৮. মফিজুর রহমান, রংপুর
৯. শেখ আবদুল আজিজ, খুলনা
১০. নওয়াব আলী, ঢাকা
১১. নূরল কবির, ঢাকা
১২. আবদুল আজিজ, কুষ্টিয়া
১৩. সৈয়দ নূরুল আলম, ময়মনসিংহ
১৪. আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী, চট্টগ্রাম।

নবীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছাত্রলীগ নেতাদের এ বিদ্রোহ ছিল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বস্তুত তা ক্ষমতাসীন মুসলিম নেতাদের জন্যে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখা দেয়। ছাত্রলীগের এই পুনর্গঠন তাঁরা সুনজরেও দেখেননি। রক্ষণশীল ছাত্রলীগ নেতা যাঁরা নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃপর্যায়ে ছিলেন, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নেতারা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে থাকেন। তবে ছাত্রলীগের বিদ্রোহী অংশের এই কর্মকাণ্ড ক্ষমতাসীন মুসলিম

লীগ নেতাদের বিরোধী ক্ষমতার বাইরের মুসলিম লীগ নেতাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সাহসী করে তুলেছিল। সত্যি বলতে কী বঙ্গবন্ধুর ছাত্রলীগের এই বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ডই নবীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রথম বিরোধীদলীয় কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটায়। কারণ পুনর্গঠিত এই বিদ্রোহী ছাত্রলীগের প্রথম প্রচারপত্রে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীনদের সমর্থনকারী ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধেই অনাস্থা ঘোষণা করা হয়নি, তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁদের বক্তব্য সরকারের বিপরীতে সুস্পষ্টভাবে অবস্থান করেছে।

ছাত্রলীগকে প্রাথমিক অবস্থায়ই একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ১৯৪৭-উত্তর পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আগানো শুধু সমস্যাই ছিল না, ছিল বিপদও। নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ছিল সরকারের পঞ্চম বাহিনী। আর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সরকারবিরোধী হিসেবে অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল ভূমিকা নিলেও কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে নতুন পাকিস্তান সম্পর্কে তখনো মোহ কাটেনি।

অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন গড়ার লক্ষ্যে ১৯৫১ সালের নভেম্বরে সিলেটে একটি ছাত্র সম্মেলন আহ্বান করা হয়। তা উদ্‌বোধন করার কথা ছিল অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সর্বশেষ সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের। আবুল হাশিম অবশ্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৪৩ সালেই মুসলিম লীগকে কমিউনিস্ট পার্টির মতো ক্যাডারভিত্তিক করে গড়ে তোলার জন্য প্রগতিশীল মুসলিম ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। দলের নিয়মিত সভায় সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের মূলনীতির ওপর আলোচনা করে ছাত্রদের উজ্জীবিত করতেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় এই তরুণ রাজনৈতিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলমান ছাত্রসমাজ বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করে এবং তাঁর সংস্পর্শে থাকার কারণে এসব ছাত্র প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকারের জন্য ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৬]

অন্যদিকে দেশ বিভাগের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব বাংলায় কাজ করে যাচ্ছিল বটে; কিন্তু সাম্প্রদায়িক জোয়ারে এবং তৎকালীন নবীন পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে ও সমালোচনায় এমন কোণঠাসা অবস্থার সম্মুখীন হয় যে তার অস্তিত্ব রক্ষা করাই আর সম্ভব হচ্ছিল না। নানাপ্রকার অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির জন্য মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলায় ছাত্র ফেডারেশন তার প্রভাবকে কাজে লাগাতে পারেনি। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকার প্রগতিশীল ও উদার মনোভাবাপন্ন ছাত্রকর্মীরা নতুন করে একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন গড়ার সম্ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। এই আলোচনাকারীদের মধ্যে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের (অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগ) কলকাতা থেকে আগত নেতারাও ছিলেন।

এই সময় ঢাকার ছাত্ররা যে নতুন অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন গড়ার চিন্তা করছিলেন– তাঁরা ৩১শে আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক ছাত্রাবাসে ঢাকা শহরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের একটি সভা আহ্বান করেন। আহ্বানকারীরা সংগঠনটির নামের পূর্বে 'মুসলিম' শব্দটি রাখা হবে কি হবে না এ নিয়ে একমত হতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত নঈমুদ্দিন আহমদ, আজিজ আহমেদ, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখের মধ্যে ৩০শে আগস্ট এক ঘরোয়া বৈঠকে ঠিক হয় যে নাম যা-ই রাখা হোক না কেন, সংগঠনের পূর্বে 'মুসলিম' শব্দটি থাকবে না। যদিও সাম্প্রদায়িক আদর্শে নব্য-প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে এই শব্দটি রাখার পক্ষে জোর অভিমত ছিল। কারণ তা না হলে সংগঠন কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত এমন বিভ্রান্তির আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ছাত্র আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর মধ্যে আমরা সে সময়েই এক অদ্ভুত প্রজ্ঞা দেখতে পাই। তিনি প্রথমেই হুট করে ছাত্রলীগের নামকরণ থেকে মুসলিম শব্দটি উঠিয়ে দেননি। তিনি এজন্য যথেষ্ট সময় নিয়েছেন এবং পাকিস্তানিদের ফাঁদে পা দেননি। যেটা বামপন্থিরা করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে সলিমুল্লাহ হলের ১২নং কক্ষে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সাংগঠনিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রলীগ অসাম্প্রদায়িককরণের একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবটি তুলেছিলেন অলি আহাদ। এ প্রসঙ্গে অলি আহাদ লিখেছেন–

> কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুর রহমান চৌধুরী ও নঈমুদ্দিন আহমদের তীব্র বিরোধিতার মুখে আমার প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়।[১৭]

প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে সলিমুল্লাহ হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সভায় এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা অলি আহাদ সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক করার এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ছাত্রকেই তার সদস্য হওয়ার অধিকার প্রদানের দাবিতে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুর রহমান চৌধুরী ও নঈমুদ্দিন আহমদ 'অসময়োচিত প্রস্তাব' বলে তা বাতিল করে দেন।

পরবর্তীকালে ছাত্রলীগের ঘোষণাপত্রে এ সম্পর্কে ও অসাম্প্রদায়িকীকরণের ইতিহাসের ওপর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়–

> ১৯৪৯ সালে এই প্রস্তাব সর্বপ্রথম উত্থিত হইলে ইহা অধিকাংশ সদস্যদের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নামকরণে কোনোপ্রকার পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে কাউন্সিলারবৃন্দের সম্মতি আবশ্যক। ভাষা আন্দোলনের চরম তৎপরতার মধ্যে ১৯৫০, ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে ছাত্রলীগের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হয় নাই। রক্তক্ষয়ী বায়ান্নোর পর ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে এই প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে কার্যকরী করা হয়।[১৮]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং অলি আহাদদের মধ্যে পার্থক্য এখানেই ছিল। অলি আহাদরা ছিলেন তথাকথিত বিপ্লবী, দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে তারা খুব তোয়াক্কা করতেন না। একটা 'বিপ্লবী' সিদ্ধান্ত নিতে পারার মধ্যেই নিজেদের বীর মনে করতেন, অন্যদের আপোশকামী আখ্যা দিতেন। এর ফলে তারা কিন্তু ইতিহাসে টিকে থাকতে পারেননি, বিলীন হয়ে গেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী,

কোন সময়ে কতটুকু আগাতে হবে এটা তিনি জানতেন। ফলে 'মুসলিম ছাত্রলীগ' থেকে কখন 'মুসলিম' শব্দ পরিবর্তন করে সর্বজনীন করতে হবে তা থেকে তিনি বিচ্যুত হননি এবং শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর হাতেই ছাত্রলীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণ সঠিক সময়েই ঘটে।

বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭-উত্তর সময়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় কীভাবে আবার ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন তার সবিশেষ বর্ণনা রয়েছে। এ বর্ণনায় তৎকালীন পরিস্থিতি ও বাস্তবতা নিয়ে যে টানাপড়েন চলছিল তারও বিশদ কথা বর্ণিত হয়েছে:

> নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগে'র নাম বদলিয়ে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' করা হয়েছে। শাহ আজিজুর রহমান সাহেবই জেনারেল সেক্রেটারি রইলেন। ঢাকায় কাউন্সিল সভা না করে অন্য কোথাও তাঁরা করলেন গোপনে। কার্যকরী কমিটির সদস্য প্রায় অধিকাংশই ছাত্র নয়, ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। ১৯৪৪ সালে সংগঠনের নির্বাচন হয়েছিল, আর হয় নাই। আমরা ঐ কমিটি মানতে চাইলাম না। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ও জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তারা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত নয়। আমি ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করলাম। আজিজ আহমেদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল হামিদ চৌধুরী, দবিরুল ইসলাম, নঈমুদ্দিন, মোল্লা জালালউদ্দিন, আবদুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আরও অনেক ছাত্রনেতা একমত হলেন, আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান করা দরকার। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে ফজলুল হক মুসলিম হলের এ্যাসেম্বলি হলে এক সভা ডাকা হল, সেখানে স্থির হল একটা ছাত্র প্রতিষ্ঠান করা হবে। যার নাম হবে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। নঈমুদ্দিনকে কনভেনর করা হল। অলি আহাদ এর সভ্য হতে আপত্তি করল। কারণ সে আর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান করবে না। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নাম দিলে সে থাকতে রাজি আছে। আমরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এবং বললাম, 'এখনও সময় আসে নাই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দেশের আবহাওয়া চিন্তা করতে হবে। নামে কিছুই আসে যায় না। আদর্শ যদি ঠিক থাকে, তবে নাম পরিবর্তন করতে বেশি সময় লাগবে না। কয়েক মাস হল পাকিস্তান পেয়েছি। যে আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান পেয়েছি, সেই মানসিক অবস্থা থেকে জনগণ ও শিক্ষিত সমাজের মত পরিবর্তন করতে সময় লাগবে'।[১৯]

অন্যত্র আরেকটি বর্ণনা–

> ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠান গঠন করার সাথে সাথে বিরাট সাড়া পাওয়া গেল ছাত্রদের মধ্যে। এক মাসের ভিতর আমি প্রায় সকল জেলায়ই কমিটি করতে সক্ষম হলাম। যদিও নঈমুদ্দিন কনভেনর ছিল, কিন্তু সকল কিছুই প্রায় আমাকেই করতে হত। একদল সহকর্মী পেয়েছিলাম, যারা সত্যিকারের নিঃস্বার্থ কর্মী। পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রকাশ্যে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে সাহায্য করত। আর আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিত।[২০]

১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনে ছাত্র-জনতার মিছিল

তবে ১৯৪৭-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছাত্র রাজনীতিতে ঘটে যায়, তাহলো ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীরা আন্দোলনে গেলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছাত্ররাও তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ৩রা মার্চ কর্মচারীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে ছাত্ররাও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বর্জন করে। ৫ই মার্চ মুসলিম ছাত্রলীগ একাই পুনরায় ধর্মঘটের ডাক দেয়। এরপর এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য এদিন যৌথ ছাত্র কর্মপরিষদ গঠিত হয় এবং উপাচার্য ভবনের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উপাচার্য জানান, বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিষদের সভায় তিনি এই বিষয়টি উত্থাপন করবেন। কর্মচারীরা সরল বিশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দিতে গেলে কর্তৃপক্ষ প্রশাসন ভবনে তাদের ঢুকতে দিতে অস্বীকার করে। এর মধ্যে নতুন পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং ছাত্রদের অবিলম্বে ছাত্রাবাস ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়।

আর একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বমোট ২৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরমধ্যে ৬ জনকে ৪ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, ১৫ জনকে ছাত্রাবাস থেকে বহিষ্কার, ৫ জনকে ১৫ টাকা এবং ১ জনকে ১০ টাকা জরিমানা করা হয়। এদের বৃত্তিও বন্ধ করা হয়। শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– দবিরুল ইসলাম, অলি আহাদ, উমাপতি মিত্র, আবদুর রহমান চৌধুরী, দেওয়ান মাহবুব আলী, আবদুল মতিন, অরবিন্দু বসু (সহ-সভাপতি, ডাকসু), শেখ মুজিব, নঈমুদ্দিন আহমদ, নাদেরা বেগম প্রমুখ।

যাঁরা বহিষ্কৃত হয়েছিল তাঁরা চিরজীবনের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন হারিয়েছিল। আর যাঁদের জরিমানা হয়েছিল তাঁদের কেউ কেউ জরিমানা দিল। কেউ কেউ ক্ষমা চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় পড়াশুনা শুরু করে দেয়। জরিমানা দিতে একমাত্র অস্বীকার করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ফলে তাঁকে সেখান থেকেই ছাত্রজীবনের ইতি ঘটাতে হয়। বাংলার ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে এ ঘটনা ট্র্যাজিক ও বেদনাদায়ক হয়ে আছে।

এই সময়ে বঙ্গবন্ধু ও বাংলার ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা

হলো ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালে সংঘটিত তিন পর্বের ভাষা আন্দোলন। ভাষা প্রশ্নকে নিছক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যে না রেখে তাকে রাজনৈতিক মর্যাদায় উন্নীত করার ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দল নয়, বরং ছাত্ররাই অধিকতর যোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই সম্পর্কে তৎকালীন ছাত্রনেতা মোহাম্মদ তোয়াহার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সাথে সাথেই ভাষার প্রশ্নটি উচ্চারিত হয়।... ভাষা সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ তেমন চিন্তা করতেন না।... বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে– এটা কোনোদিন কারো মাথায় ঢোকেনি। বুদ্ধিজীবী মহলে খানিকটা এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা হত, তবে এটাকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিবর্তিত করে ঢাকার ছাত্রসমাজ।[২১]

১৯৪৮ সালে সংঘটিত এ ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৫ই মার্চ আন্দোলনের চাপে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার ছাত্র সমাবেশে বঙ্গবন্ধু সভাপতিত্ব করেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন–

> ১৬ তারিখ সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভায় আমরা সকলেই যোগদান করলাম। হঠাৎ কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করে বসল সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য। সকলেই সমর্থন করল। বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হল। অনেকেই বক্তৃতা করল। সংগ্রাম পরিষদের সাথে যেসব শর্তের ভিত্তিতে আপোস হয়েছে তার সকলগুলিই সভায় অনুমোদন করা হল। তবে সভা খাজা নাজিমুদ্দীন যে পুলিশি জুলুমের তদন্ত করবেন, তা গ্রহণ করল না; কারণ খাজা সাহেব নিজেই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমি বক্তৃতায় বললাম, 'যা সংগ্রাম পরিষদ গ্রহণ করেছে, আমাদেরও তা গ্রহণ করা উচিত। শুধু আমরা ঐ সরকারি প্রস্তাবটা পরিবর্তন করতে অনুরোধ করতে পারি, এর বেশি কিছু না।' ছাত্ররা দাবি করল, শোভাযাত্রা করে আইন পরিষদের কাছে গিয়ে খাজা সাহেবের কাছে এই দাবিটা পেশ করবে এবং চলে আসবে। আমি বক্তৃতায় বললাম, তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েই আইনসভার এরিয়া ছেড়ে চলে আসবেন।[২২]

পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, যারা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন এবং গবেষণা করেছেন, তারা বঙ্গবন্ধুর আগাগোড়া ভূমিকাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। বঙ্গবন্ধু যে প্রথম থেকেই পাকিস্তানি এবং এদেশের একদল বাঙালি লেখক-ইতিহাসবিদের চক্ষুশূল ছিলেন তা তাঁর সম্পর্কে মূল্যায়ন অথবা মূল্যায়ন করতে ব্যর্থতা থেকেই প্রমাণ হয়। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ইতিহাসের এরকম শত শত তথ্য ও সত্যকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পথ খুলে দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর আরো একটি সিদ্ধান্ত এবং ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগকে পরাজিত করতে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্য করে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। যুক্তফ্রন্ট করার জন্য অতি উৎসাহী ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট খুব ইতিবাচকভাবে আলোচিত হয়। বিশেষ করে বামপন্থি লেখক-ইতিহাসবিদরা যুক্তফ্রন্টের ভূমিকাকে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী পড়লে আমরা দেখি, তিনি যুক্তফ্রন্ট গঠন করা বেশি পছন্দ করেননি। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, বঙ্গবন্ধুর কথাই সত্য হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট কোনো কাজের কাজে আসেনি। বরং বিভেদ, দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষে যুক্তফ্রন্ট পাকিস্তানের রাজনীতিতে দীর্ঘ সামরিক শাসন ডেকে নিয়ে এসেছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে লিখেছেন–

> ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন হবে ঘোষণা করা হল। আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ রইল না। 'গণতান্ত্রিক দল' নামে একটা রাজনৈতিক দল করা হয়েছিল, তা কাগজপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।...
>
> এই সময় আওয়ামী লীগের মধ্যে সেই পুরাতন গ্রুপ যুক্তফ্রন্ট করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আবদুস সালাম খান, ময়মনসিংহের হাশিমউদ্দিন ও আরও কয়েকজন এজন্য প্রচার শুরু করলেন। এদিকে তথাকথিত প্রগতিশীল এক গ্রুপও বিরোধী দলের ঐক্য হওয়া উচিত বলে চিৎকার আরম্ভ করলেন। অতি প্রতিক্রিয়াশীল ও অতি প্রগতিবাদীরা এই জায়গায় একমত হয়ে গেল। কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল তখন ছিল না– একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া– যার নাম জনসাধারণ জানে। ভাসানী সাহেব ও আমি পরামর্শ করলাম, কি করা যায়! তিনি আমাকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, যদি হক সাহেব আওয়ামী লীগে আসেন তবে তাঁকে গ্রহণ করা হবে এবং উপযুক্ত স্থান দেওয়া যেতে পারে। আর যদি অন্য দল করেন তবে কিছুতেই তাঁর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করা চলবে না। যে লোকগুলি মুসলিম লীগ থেকে বিতাড়িত হয়েছে তারা এখন হক সাহেবের কাঁধে ভর করতে চেষ্টা করছে। তাদের সাথে আমরা কিছুতেই মিলতে পারি না। মুসলিম লীগের সমস্ত কুকার্যের সাথে এরা ১৯৫৩ সালে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জড়িত ছিল। এরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতাও করেছে। মওলানা সাহেব আমাদের অনেকের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমাকে বলে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগ সদস্যদের মধ্যে যেন যুক্তফ্রন্ট সমর্থকরা মাথা তুলতে না পারে।[২৩]

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ধরা পড়েছিল যখন পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের কোলাহল ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংকটের ছুঁতোয় পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়েছিল। এ সম্পর্কেও বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়নটি গুরুত্বপূর্ণ–

> পূর্ব বাংলায় গভর্নর শাসন জারি করার দিন প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী যে বক্তৃতা রেডিও মারফত করেন, তাতে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেবকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' এবং আমাকে 'দাঙ্গাকারী' বলে আক্রমণ করেন। আমাদের নেতারা যারা বাইরে রইলেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ করারও দরকার মনে করলেন না। দেশবাসী ৬ই জুনের দিকে চেয়েছিল, যদি নেতারা সাহস করে প্রোগ্রাম দিত তবে দেশবাসী তা পালন করত। যেসব কর্মী গ্রেফতার হয়েছিল তারা ছাড়াও যারা বাইরে ছিল তারাও প্রস্তুত ছিল। আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ও ত্যাগী কর্মীরা নিজেরাই প্রতিবাদে যোগ দিতে পারত। যুক্তফ্রন্টের তথাকথিত সুবিধাবাদী নেতাদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে তাও তারা করতে পারল না। অনেক কর্মীই চেষ্টা করে গ্রেফতার হয়েছিল। যদি সেইদিন নেতারা জনগণকে আহ্বান করত তবে এতবড় আন্দোলন হত যে কোনোদিন আর ষড়যন্ত্রকারীরা সাহস করত না বাংলাদেশের উপর অত্যাচার করতে। শতকরা সাতানব্বই ভাগ জনসাধারণ যেখানে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিল ও সমর্থন করল, শত প্রলোভন ও অত্যাচারকে তারা ভ্রুক্ষেপ করল না– সেই জনগণ নীরব দর্শকের মত তাকিয়ে রইল! কি করা দরকার বা কি করতে হবে, এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করা উচিত হবে কি না, এ সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ একদম চুপচাপ।
>
> একমাত্র আতাউর রহমান খান কয়েকদিন পরে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। ৯২ (ক) ধারা জারি হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে

মওলানা ভাসানী বিলাত গিয়েছেন। শহীদ সাহেব অসুস্থ হয়ে জুরিখ হাসপাতালে, আর আমি তো কারাগারে বন্দি। নীতিবিহীন নেতা নিয়ে অগ্রসর হলে সাময়িকভাবে কিছু ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সংগ্রামের সময় তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। দেড় ডজন মন্ত্রীর মধ্যে আমিই একমাত্র কারাগারে বন্দি। যদি ৬ই জুন সরকারের অন্যায় হুকুম অমান্য করে (হক সাহেব ছাড়া) অন্য মন্ত্রীরা গ্রেফতার হতেন তা হলেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু হয়ে যেত। দুঃখের বিষয়, একটা লোকও প্রতিবাদ করল না। এর ফল হল ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পারল যে, যতই হৈচৈ বাঙালিরা করুক না কেন, আর যতই জনসমর্থন থাকুক না কেন, এদের দাবিয়ে রাখতে কষ্ট হবে না। পুলিশের বন্দুক ও লাঠি দেখলে এরা পালিয়ে গর্তে লুকাবে। এই সময় যদি বাধা পেত তবে হাজার বার চিন্তা করত বাঙালিদের উপর ভবিষ্যতে অত্যাচার করতে।

এই দিন থেকেই বাঙালিদের দুঃখের দিন শুরু হল। অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনোদিন একসাথে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতে নেই। তাতে দেশসেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়।[২৪]

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের এ অভিজ্ঞতা ও পরিণতিকে পরবর্তীকালে মনে রেখেছিলেন। ফলে তিনি আর পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিশেষ করে নির্বাচনি রাজনীতিতে ঐক্য প্রক্রিয়ায় সময় নষ্ট করেননি। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করা, এ লক্ষ্যে যা যা করা দরকার তিনি তার সবই করেছেন। ১৯৬২ সালের প্রথম থেকেই সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন শুরু করতে তিনি গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। উদ্দেশ্য সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগের পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়নও থাক। পরে দেখা গেছে এন.এম.এফ. এবং ছাত্রশক্তিও এসব আন্দোলনে শামিল হয়েছে। এ আন্দোলন আইয়ুব খানের শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ছাত্রদের আন্দোলন পাকিস্তানবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে চাঙা করে তুলেছিল।

তবে বঙ্গবন্ধু ছাত্র রাজনীতির মূলধারাকে ১৯৬৬ সালে উত্থাপিত তাঁর ৬ দফাকে সারা দেশে জনপ্রিয় করতে কাজে লাগিয়েছিলেন। ছাত্ররা পরম উৎসাহে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফাকে সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল, যার সুফল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাওয়া গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু জানতেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রবীণ নেতাদের দ্বারা বাংলাদেশ স্বাধীন করতে পারবেন না, তিনি তাই কাজে লাগিয়েছিলেন ছাত্রলীগের তরুণ নেতা-কর্মীদের। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন, ছাত্ররা সকলেই ৬ দফার আন্দোলনে চলে আসুক। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা সফল হয়েছিল। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), এন.এস.এফ. প্রমুখ সংগঠনের সমন্বয়ে ১৯৬৯ সালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফায় বঙ্গবন্ধুর ৬ দফাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর ফলে যে বিশাল গণ-অভ্যুত্থান পাকিস্তানের মাটিতে সংঘটিত হয়েছিল তাতে বিজয়ী বীর হয়ে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আসলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি যে এ সময় 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব প্রাপ্ত হন, তাও দেশের সকল ছাত্র সংগঠনের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব প্রদানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন ডাকসু ও ছাত্রলীগের নেতা তোফায়েল আহমেদ এবং উপস্থিত জনতার পক্ষে সমর্থন করেন এন.এস.এফ.-এর মাহবুবুল হক দুলন। মঞ্চে এ সময় ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর মাহবুব উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই এভাবে বঙ্গবন্ধু বাংলার আপামর জনগণ, বিশেষ করে ছাত্রসমাজেরও একচ্ছত্র নেতায় পরিণত হন। কোনো ছাত্র সংগঠনই বঙ্গবন্ধুকে উপেক্ষা করতে পারেনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা ছাত্রসমাজের কাছে সমুন্নত থাকে। বিরোধী ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলন (১৯৭৩ এবং ১৯৭৪) দু'বারই বঙ্গবন্ধু উদ্‌বোধন করেন। ডাকসুতে বিরোধী ছাত্র সংগঠন জয় লাভ করলে বঙ্গবন্ধু গণভবনে ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের ডেকে মিষ্টি মুখ করান। ফলে ছাত্রলীগের সাথে এক কাতারে ছাত্র ইউনিয়নও বঙ্গবন্ধুর দেশ গড়ার সংগ্রামে শামিল হয়েছিল। এটি তৃতীয় বিশ্ব বলে পরিচিত তৎকালীন দুনিয়ায় একটি ব্যতিক্রম ঘটনাই ছিল, যেখানে বঙ্গবন্ধু সরকারি দলের বাইরে বিরোধী শিবিরেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি এখনো এভাবেই একাকার হয়ে আছে।

তথ্যপঞ্জি

১. সমীর সেনগুপ্ত: *সমকাল ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১১৬ এবং মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান: *বাংলাদেশের তারিখ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২১।

২. শেখ মুজিবুর রহমান: *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৮-৯।

৩. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯।

৪. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১।

৫. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪।

৬. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪।

৭. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।

৮. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬।

৯. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬-১৭।

১০. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭।

১১. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭।

১২. কামরুদ্দিন আহমদ: *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৩৮২, পৃষ্ঠা-৮০।

১৩. বিস্তারিত দেখুন ড. মোহাম্মদ হাননান: *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮০০-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৪৫।

১৪. সরদার ফজলুল করিম: 'চল্লিশের দশকের ঢাকা', *দৈনিক সংবাদ*, ১৪ই জুন ১৯৮৪।

১৫. প্রচারপত্র 'পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আবেদন', ২ নং সার্কুলার, মার্চ ১৯৪৮।

১৬. অলি আহাদ: *জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫-১৯৭৫)*, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৮।

১৭. কামরুদ্দিন আহমদ: *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ, ১৮৮৩ বঙ্গাব্দ, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬৪।

১৮. অলি আহাদ: *জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫-১৯৭৫)*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮০।

১৯. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৮-৮৯।

২০. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৭।

২১. ভাষা সৈনিক মোহাম্মদ তোয়াহার স্মৃতিচারণ, একুশে সংকলন, ১৯৮১, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা-৮৭।

২২. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৬।

২৩. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৪।

২৪. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৩।

লেখক: গ্রন্থকার ও গবেষক

মুজিববর্ষ: শতবর্ষের মহাপুরুষ বঙ্গবন্ধু

খালেক বিন জয়েনউদদীন

মহাকাব্যের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা তাঁকে নানাভাবে নানা অভিধায় বিভূষিত করেছি। তিনি আমাদের জাতির পিতা ও বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং বঙ্গবন্ধু। ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক বলেছেন, শেখ মুজিব দুই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। আমাদের জ্যেষ্ঠদের কাছে এখনো তিনি মুজিব ভাই।

শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ। ২০২০ সালের জন্মদিনে তাঁর শতবর্ষ পূরণ হবে। তিনি শতবর্ষের মহাপুরুষ এবং শতবর্ষের আলোয় উদ্ভাসিত আমাদের ভালোবাসার মহানায়ক। আমাদের শয়নে-স্বপনে এবং জাগরণে তাঁর উপস্থিতি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। তিনি বাঙালির মুক্তির মধ্যরাতের সূর্যতাপস।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মুজিববর্ষ পালন করছি। দুই হাজার উনিশের সতেরোই মার্চ থেকে দুই হাজার একুশের সতেরোই মার্চ পর্যন্ত– এই সময়টুকুই মুজিববর্ষের দিনক্ষণ। বর্ষ পালনের আনন্দ-উল্লাসের মধ্যেও আমাদের দুঃখ-বেদনার শেষ নেই। ঐ যে পঁচাত্তরের আগস্টে আমরা তাঁকে হারিয়েছি বাঙালির চিরশত্রু এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিভিষণদের গভীর ষড়যন্ত্রে। আমরা ঘরের সোনা ধরে রাখতে পারিনি। এই অপারগতার বেদনা আমাদের চিরকাল বয়ে বেড়াতে হবে। এই দুঃখবোধের মধ্যেও জীবন চলমান। তাই বঙ্গবন্ধু আমাদের সাথেই থাকবেন মহীরুহ হয়ে।

তিনি ছিলেন আপাদমস্তক বাঙালি এবং খাঁটি বাঙালি। জন্মেছিলেন প্রাচীন বাংলার জলেডোবা এবং নদীবিধৌত একটি গ্রামে। এই গ্রামটির উত্তরে একটি নতুন মহকুমা শহর। সেই শহর থেকে ওই গ্রামটিতে যাবার একমাত্র বাহন নৌকো। পায়ে হেঁটেও যাওয়া যেত। কিন্তু অনেক সময় লাগাতো। সেই জলেডোবা গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া। অনেকে বলেন– জলেডোবা ছিল বলে মানুষ সেখানে টং পেতে বসবাস শুরু করেছিল। এক সময় গ্রামটির নামকরণ হলো টুঙ্গিপাড়া। তার আগে ছোট্ট জনপদটি অজোপাড়াগাঁই ছিল। তারপর এই গ্রামটিতে বাসা বাঁধলেন কাজীরা। শেখেরাও বসবাস শুরু করলেন। এ সময় বয়ে যাওয়া খালের দুই পাড়ে অন্যেরা ঘর উঠিয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হলেন। অদূরে প্রাচীন ঘাঘোর নদীর বয়ে যাওয়া পাড়ে পাটগাতী বন্দর।

আমরা সবাই বাঙালি। গ্রামবাংলায় আমাদের আদি নিবাস। আমাদের আদি পরিচয় মাছে-ভাতে বাঙালি। মায়ের বোলই আমাদের মাতৃভাষা। সেই মাতৃভাষার নাম বাংলা। তাই আমরা চলনে-বলনে এবং বেশভূষায় বাঙালি। একটু বড়াই করে যদি বলি তাহলে আমরা বলব– নিখাঁদ বাঙালি। বাঙালি লন্ডন-আমেরিকা গেলেও মাছ-ভাতের কথা ভুলতে পারবে না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও যেমন বাঁড়া বাঁধবে, বাঙালির অবস্থাও তাই। পরনে থাকা চাই– লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবি। আর খাওয়া-দাওয়া শেষে তাম্বুক এবং আলবেলায় একটু টান মারতেই বাঙালিয়ানা সার্থক।

বাঙালির আর একটা বড়ো পরিচয় আছে আমোদ-প্রমোদে তারা স্বতঃস্ফূর্ত। নানা ধরনের ক্রীড়া ও সংগীতে বাঙালির ভীষণ ঝোঁক। বারো মাসে তেরো পার্বণ। ঈদ-মহররম তো আছেই। এই নিয়েই বাঙালির গর্ব ও গৌরব। প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ড. নীহার রঞ্জন রায় তাঁর বাঙালির ইতিহাসে এমনটি বর্ণনা করেছেন।

বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারায় একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালির হাজার বছরের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তির নিশান উড়িয়েছেন এই জনপদে। তিনি নির্যাতন-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে পথে-প্রান্তরে ঘুরে জাগিয়েছেন। তাঁর ডাকে সাড়া যুগিয়েছে বাংলার মানুষ। তাঁকে চৌদ্দটি বছর শাসক পাকিস্তানিদের অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। তবু তিনি সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা ভোলেননি। তাঁকে হত্যা করার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা আনা হয়েছে। বন্দিখানার কাছে কবর খোঁড়া হয়েছে। তবু তিনি অটল। আপোশ করেননি। বাঙালির স্বপ্ন ও স্বার্থই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তাঁর আপোশহীন সংগ্রামের কাছে পরাজিত হয়েছে স্বার্থান্বেষী মহল। তাই

১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

তিনি ফিরে এসেছেন বাঙালি স্বজনের কাছে। বাংলার মানুষও তাঁকে বঙ্গবন্ধু অভিধায় ভূষিত করেছে। তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে। বাঙালির-বাংলার তাই তিনি শ্রেষ্ঠ সন্তান। কোনো জরিপে এই নির্ধারণ নির্ণীত হয়নি। সাধারণ মানুষের ভালোবাসাই তাঁকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। এই ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না। তিনিও ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছেন জীবন, পরিবার, স্বজন ও সহচরদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে। আজ তিনি বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সাথে মিশে অমরত্ব লাভ করেছেন। বিলাসহীন জীবনযাপনের জন্যই এই প্রাপ্তি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা বলি– তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি। তাঁর আচার-আচরণে ও জীবনযাপনে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী ধারা বিদ্যমান ছিল। তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে বাঙালির রাখালিয়া সমাজে। শেখ পরিবার বনেদি এবং কিছুটা সচ্ছল হলেও তাঁর বন্ধুরা ছিল সাধারণ পরিবারের সন্তান। শেখ পরিবার কখনোই সাধারণ সমাজের বাইরে ছিল না। বঙ্গবন্ধুর বাবা ছিলেন গোপালগঞ্জ মহকুমা কার্যালয়ের একজন চাকুরে। এজন্য বঙ্গবন্ধুর কোনো দেমাগ ছিল না। তাঁর খেলার সাথিরাও ছিল গ্রামের সাধারণ পরিবারের ছেলে। এসব ছেলেরা বেশভূষায় যেমনটি ছিল, কিশোর খোকাও তেমনটি ছিলেন। গ্রাম থেকে শহরে আসা একজন কিশোর যেমন কাদামাটি গায়ে মেখে শহরকে দেখে, তিনিও সেই

চোখে গ্রামকেন্দ্রিক শহরে থেকেছেন। আর সময় পেলেই পায়ে হেঁটে কিংবা বাবার পানসী নৌকোয় চড়ে টুঙ্গিপাড়ায় গেছেন, যেখানে মা-বাবার ঘরগেরস্তি বাংলার সেই চিরায়ত ঘরদুয়ার, দোআঁশ মাটি, বিলঝিল, পানা-পুকুর, ছনের বারান্দা আর পাখপাখালির ডাকে মুখরিত সবুজ পাতা-পল্লব। এ যেন বাঙালির হাজার বছরের চিরচেনা পরিবেশ।

এ পরিবেশের সন্তান জজ, ব্যারিস্টার, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট যাই হোক না কেন, তিনি কি ভুলে যাবেন তাঁর শৈশবের স্কুলে যাওয়া কাদামাটির পথ, গাছের খোড়লে দোয়েল পাখির ডিম খোঁজা ও ছানা পোষা। তিনি কি ভুলে যাবেন বৃষ্টিতে ভেজা, খালবিলে শাপলা তোলা, ভাদ্রে তালের পিঠা খাওয়া আর জোছনায় উঠোনে বসে চন্দ্রের আলোয় দাদির কোলে গল্প শোনা। বঙ্গবন্ধুর এমনই ছিল শৈশব-কৈশোরকাল।

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর কলেজ ও বিশ্বদ্যিালয়ের জীবন উন্মেষের কাল। বাঙালির অধিকার বা মুক্তির সংগ্রামটা এ পর্যায় থেকে শুরু। এরপর আজীবন সংগ্রাম ও কারাজীবন। সংগ্রামকালে তিনি পুরো বাংলাদেশে হেঁটেছেন। মানুষের আচার-আচরণ ও স্বভাবে ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কাদের প্রেসিডেন্ট? বাঙালি সাধারণ মানুষের। ঘরে ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। প্রেসিডেন্ট হয়ে রাজপ্রাসাদে (বঙ্গভবন) থাকেননি। নিজের ছোট্ট বাসায় থেকেছেন। তাঁর বাসাটি কেমন ছিল? বেতবনে ছাওয়া, বাড়ির পেছনে গরুর আথাল আর পাশেই কবুতরের খোপ। এ যেন টুঙ্গিপাড়ার মতো আরেক পাড়া। বেশভূষায় তিনি ছিলেন অতি সাধারণ। ঘরে ঢুকেই লুঙ্গি পরতেন, গায়ে দিতেন হাতাঅলা, কখনো হাতাছাড়া গেঞ্জি। প্রথম জীবনে নিয়মিত পায়জামা-পাঞ্জাবি পরতেন। তাঁর গায়ের কোর্টটি আজো মুজিব কোর্ট নামে সুপরিচিত। আর দেশের বাইরে গেলে, যা পরা উচিত, তাই পরতেন। ধূমপান করতেন তিনি। প্রথমে আলবেলা, পরে পাইপ ব্যবহার করতেন। বাসায় দলীয় কর্মীরা গেলে মুড়ি ও চাল ভাজা দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। কৈশোর থেকেই চোখে চশমা ব্যবহার করতেন। আর শীতকালে তাঁর গায়ে জড়ানো থাকত চাদর। খাওয়া-দাওয়ায় ছিলেন অতি সাধারণ। ভাত-মাছ, শাকসবজি ছিল তাঁর প্রিয়। কই মাছের প্রতি টান ছিল তাঁর। তিনি জন্মেছিলেন জলেডোবা মাছের দেশে। কৈশোরে মায়ের হাতের পিঠা ও দুধভাত খাওয়ার কথা আমরা জেনেছি বিভিন্ন রচনায়।

বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ছিলেন তিনি। লোকাচার ও লোকজ সংস্কৃতি বিকাশে তাঁর অবদানের কথা আমরা সবাই জানি। নিজের জনসভায় গান পরিবেশনের জন্য প্রখ্যাত গীতিকার কে এম চাঁদ মিয়াকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নামজাদা গীতিকার রোকনউদ্দিনকে ভীষণ ভালোবাসতেন এবং জনসভায় নিয়ে যেতেন। বঙ্গবন্ধুর কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি আমাদের জাতীয় সংগীত।

শৈশব-কৈশোরে তিনি ভীষণ পাখি প্রিয় ছিলেন। বাড়িতে বোনদের নিয়ে দোয়েল, ময়না, শালিক ও কবুতর পুষতেন। আজ দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। আর বাড়ির পাশে খালবিলের অনাদরের শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। খাঁটি বাঙালি না হলে এসব জাতীয় পর্যায়ে মর্যাদার আসনে পেতাম না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু বাঙালির নবউত্থান, জাগরণ ও স্বাজাত্যবোধে অটল থেকে একাত্তরের ২৩শে মার্চ থেকে স্বীয় ভবন ও গাড়িতে বাংলাদেশের নতুন পতাকা ব্যবহার শুরু করেন। এও এক বাঙালির স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং আলাদা হবার প্রস্তুতি। বঙ্গবন্ধু সেই প্রথম বাঙালি, যিনি বিশ্বসভায় (জাতি সংঘ) ১৯৭৪ সালে বাংলায় ভাষণ দিয়ে গোটা বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছিলেন। একজন ভীষণ মাতৃভাষা প্রিয় বাঙালির পক্ষেই এটা সম্ভব। আবদুল গাফফার চৌধুরী ঠিকই বলেছিলেন– তিনি ছিলেন রাখাল রাজা, বাঙালির প্রিয় স্বজন। তিনি ছিলেন বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, পুণ্ড্র, সুহ্ম অঞ্চলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। যাঁর গড়ন, আকৃতি, নেত্রবলি এবং গায়ের রং ও উচ্চতা বাঙালির নিজস্ব অবয়বে গঠিত। আর এ ধারায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জনঅবিচ্ছিন্ন পরিবেশে একাকার হয়ে বাঙালি জাতির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার জনপ্রবাহে শেখ মুজিব বাঙালির বৈশিষ্ট্য অর্জন করেই জন্মেছিলেন। খাঁটি বাঙালি এই অভিধা তাঁর ক্ষেত্রেই বেশি শাস্ত্রসম্মত।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ও চিন্তাবিদ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তাঁর বহুল সমাদৃত গ্রন্থ মধ্যরাতের সূর্যতাপসে বলেছেন– আধুনিক যুগের আধুনিক বাংলা গড়ায় যে নতুন রাজনীতি সূচনা করে গেছেন– চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু, শেরেবাংলা ফজলুল হক, আবুল হাশিম ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, তার বৈপ্লবিক সমাপ্তি টেনে আনার নিকট কৃতিত্ব শেখ মুজিবুরের। তিনি ইতিহাসের সন্তান, নিজে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

শতবর্ষের আলোয় বঙ্গবন্ধু আজ নক্ষত্ররাজ। আমরা এবং বাংলাদেশ তাঁর দীপ্ত আলোয় উদ্ভাসিত। তিনি আমাদের ভালোবাসার আরাধ্য মহাপুরুষ। তাঁর স্বপ্নের ভূমিতে বাঙালির অধিষ্ঠান। মুজিববর্ষের স্মরণিতে আমাদের প্রতিদান শুধু শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাঁর দানের প্রতিদানে আমাদের দেবার মতো কিছুই নেই। তাঁর বৈভবপূর্ণ জীবন ও আদর্শ আমাদের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে প্রেরণা জোগাবে– এটা আমরা জোর গলায় বলতে পারি।

জয় বাংলা।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

মহৎপ্রাণ মনীষীর জীবন ও সংগ্রাম

শাফিকুর রাহী

শত জনমের শত বাধার আঁধার কেটে জেগে ওঠে এ শ্যামল গালিচায় এক মানবিক সূর্যসন্তান, তাঁর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁর জীবন শুরু হয়েছিল পল্লির অজো-গ্রামে, যে লোকালয়ে ছিল না কোনো ঝলমলে বিজলিবাতি, পাকা রাস্তাঘাট কিংবা মনোরম পুষ্পিত উদ্যান। নদনদী আর খালবিলে ঘেরা সে জনপদে মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার প্রতিবন্ধকতার জাল ছিন্ন করে যে জনদরদি শিশুটি মানবিকতার স্বপ্নবীজ বপন করেছিলেন সাধারণ খেটে-খাওয়া কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতার মনের গভীরে, তা ছিল এক অভাবনীয় অদ্ভুত বিরল দৃষ্টান্ত। মায়ের আদরের ডাক নাম খোকা। পরবর্তী সময়ে কারো কাছে শেখ সাহেব, কারো কাছে লিডার, কেউ কেউ আবার সম্মানের সঙ্গে নেতা বলেও সম্বোধন করেছেন এই অসামান্য প্রতিভাধর মানুষটিকে। যিনি ঘোর অন্ধকার মেঘলাকাশে স্বপ্নের সূর্যসারথি হয়ে জানান দিলেন অধিকার বঞ্চিত গণমানুষের মলিন অবয়বে আর শনের ভাঙা ডেরায় ভালোবাসার আলো ফোটাবেন বলে। যে মহান মানুষটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে– বীর বাঙালির অমর উপাখ্যানের বিরল বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস।

শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তী সময়ে বিদগ্ধজনের নেতৃত্বেরই পরম শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ও 'জাতির পিতা' খেতাবে জ্যোতির্ময় প্রভায় বিভূষিত হলেন। তাঁর প্রতি মানুষের বিশ্বাস আর ভালোবাসার বীরত্বপূর্ণ অবদানে খ্যাতির স্বর্ণশিখরে উপনীত হলেন বাঙালির পরম গর্বের ধন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ইতিহাস নির্মাণ করেছেন তাঁর মতো করে। মানবকল্যাণের টানে নিজস্ব গতি ও প্রগতির অন্বেষণে তিনি ছিলেন সর্বদা ধাবমান। তাঁর প্রবল প্রজ্ঞা বারবার প্রমাণিত হয়েছে মানবসভ্যতা বিকাশের অসঙ্গতি দূর করার প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে। তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন বিশ্ববসতি গড়ে উঠবে বনারণ্যে ঘেরা একটি গ্রামের মতো করে, যে বিশ্বগ্রামে থাকবে না কোনো বিবাদ-বিভাজন। যে জমিনে হবে ফুল-পাখিদের অভয়ারণ্য আর সে মনোরম পরিবেশে হেসে-খেলে বেড়ে উঠবে আগামীর শিশুরা। যারা বড়ো হয়ে জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে কেউ কবি-সাহিত্যিক হবে, কেউ বিজ্ঞানী কিংবা দার্শনিক হবে এবং কেউ হবে রাজনৈতিক নেতা– যারা মানুষের কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করার তাগিদ অনুভব করবে।

আমাদের আবেগঘন শ্রদ্ধায় সমগ্র বিশ্ববাসী জানবে বাঙালি জাতিরাষ্ট্রে বীরের মর্যাদা আজো শতভাগ অক্ষুণ্ন রয়েছে। পাক-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এ দেশীয় দালালদের সকল বীভৎস উন্মাদনাকে নরকের নর্দমায় ঘৃণাভরে নিক্ষেপ করে জানান দেয় বাঙালি বীরের জাতি। বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শে আজো আমরা আলোকিত আগামীকে আলিঙ্গন করি। তিনি মুক্তির জিকিরে নিজেকে জানান দিয়েছেন বারবার, আর বলেছেন অন্যায়-অবিচার কিংবা অমানবিক অপকর্মের সাথে আপোশ জানে না বাঙালি জাতি। তাঁর জীবন সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল সম-অধিকারের অসাধারণ কৃতিত্বের উজ্জ্বল ইশতাহার। যেখানে কোটি কণ্ঠ এককণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তাঁর গৌরবোজ্জ্বল পথচলায়। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অনন্ত জাগরণের মূর্তপ্রতীক, মৃত্যুহীন এক মহৎপ্রাণ, তাঁর কাছে আমাদের চিরদিনের ঋণ, যা কখনো শোধ হবার নয়। বিশ্ববিবেকের প্রকৃত প্রস্তাবে জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব অনেক বেশি শক্তিমান– তিনি চিরজাগরুক, চিরভাস্বর, মৃত্যুঞ্জয়ীপ্রাণ। আকাশ সমান উচ্চতায়

বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক পরিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিব মি. রমেশ চন্দ, ২৩শে মে ১৯৭৩

উদারতায় যিনি মানবতার পক্ষে লড়াই সংগ্রামে ছিলেন আপোশহীন। বিশ্বের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে বিশেষ গুণাবলির বৈশিষ্ট্যের কারণে।

লাঞ্ছনা-বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ, ছাত্র, জনতা ও সৈনিকের কম্পিত হৃদয় মাঠে অধিকার আদায়ের তীব্র মশাল জ্বালাতে গিয়ে তিনি নিজেই নির্যাতিত হয়েছেন, বারবার কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন, অনেকবার ফাঁসির মঞ্চেও দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে। তিনি তো কখনো পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছে অন্যায় কোনো আবদার কিংবা দাবি করেননি; সবসময় বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর অত্যন্ত ন্যায্য অধিকারের কথা বলেছিলেন। বাঙালির সামান্যতম অধিকার ও বৈষম্য দূর করার দাবি নিয়ে বারবার প্রতিবাদ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে সোনালি নক্ষত্র হয়ে বিরাজমান। অনন্তকাল ধরে সেটি অক্ষুণ্ন থাকবে ইনশাআল্লাহ। একজন মানুষ এত স্বল্প সময়ের সংগ্রামী জীবনে বিপুল বিজয়ের মধ্য দিয়ে একটি জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটালেন। যাঁর প্রতি গণমানুষের আত্মবিশ্বাস এতটাই প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁর হাতের ইশারায় মানুষ জেগে ওঠার আনন্দে বলিয়ান হতো। বঙ্গবন্ধুর মতো অমন মানবিক তেজদীপ্ত নেতা বিশ্বে বিরল। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামী জীবনের অঙ্গীকার ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। শান্তির পক্ষে অপ্রতিরোধ্য অভিযানে তিনি ছিলেন অতন্দ্রপ্রহরী। কে হিন্দু, কে খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ কিংবা মুসলিম এটা কখনো ভাবেননি। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন মানুষ সবাই সমান এক স্রষ্টার সৃষ্টি। এ পবিত্র ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি ও ব্যবসা করে তাদের এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেও তিনি সবসময় সোচ্চার ছিলেন।

তাঁর আপোশহীন নেতৃত্ব আর দুঃসাহসী মনোবল বারবার প্রমাণিত হয়েছে পাক-জান্তাদের কাছে, সে কারণেই তারা বঙ্গবন্ধুর গতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করেও চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

পাক-দখলদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ফাঁসানোর কত অপচেষ্টাই না করেছে, তাঁর ওপর অলীক অপবাদ চাপানো হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে দোষী করে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হলো। কিন্তু দেশের জনগণের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের কাছে পাকিস্তানিরা নতিস্বীকার করে বাঙালির প্রাণের নেতা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। এমনিভাবে দীর্ঘপ্রায় তেইশ বছর ধরে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকগোষ্ঠী– বঙ্গবন্ধুর ওপর নানা অমানবিক নির্যাতন নিপীড়নের খড়্গ হাকায়, যা ছিল একেবারেই মানবতাবিরোধী অমার্জনীয় অপরাধ। কালে কালে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে সত্যের জয় আর মিথ্যাচারী স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর ভয়াবহ পরাজয় ও পতনের নির্মম কলঙ্কিত ইতিহাস।

শিশু-কিশোরদের ভালোবাসায় সিক্ত বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু বিশ্বে একমাত্র নেতা যার দীর্ঘ রাজনীতির পথচলায় কখনো ভুলেও চরম শত্রুকেও আঘাত করার নজির নেই। তিনি সবসময় শান্তির পক্ষে ছিলেন সোচ্চার এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন দ্রোহ।

অধিকার বঞ্চিত জনমানুষের কান্না বঙ্গবন্ধু চিন্তামগ্ন চৈতন্যে ধারণ করেছিলেন বলেই তো বাংলার সচেতন নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক নেতা, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সকল শ্রেণিপেশার ব্যক্তিবর্গ বঙ্গবন্ধুকে আপন জীবন থেকেও বেশি ভালোবাসতেন। আর সে ভালোবাসার মূল্য দেওয়ার জন্য তিনি প্রায় বলতেন যে, 'তোরা আমার বাঁচন মরণের একমাত্র সঙ্গী, তোদের এ ভালোবাসার ঋণ আমি যে করেই হোক পরিশোধ করে যাবো ইনশাআল্লাহ'। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, কারো মনে কষ্ট দিয়ে তিনি কখনো কথা বলেননি। চরম শত্রুকেও বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা জানানোর অনেক ইতিহাস রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু মাটি আর মানুষকে ভালোবেসেছেন একেবারেই নিঃস্বার্থভাবে। তাঁর চিন্তা-চেতনায়, ধ্যানে-জ্ঞানে বাংলার নির্যাতিত, নিপীড়িত গণমানুষের মুক্তির ব্যাকুল আরাধনায় জানান দিয়েছেন যে, এ বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিকার আমি জীবন দিয়ে হলেও প্রতিষ্ঠা করব। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন, কিন্তু আমরা আত্মঘাতী ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয়ই শুধু নয়, এক সামরিক জান্তা ভয়ঙ্কর গুপ্ত হন্তারক বঙ্গবন্ধুর নাম নিশানাও মুছে ফেলতে চেয়েছিল ইতিহাস বিকৃতির ঘৃণ্য চক্রান্তের মাধ্যমে।

সে সামরিক জান্তার লোভ-লালসার হিংস্র থাবায় ছিন্নভিন্ন যখন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের পবিত্র মানচিত্র– সর্বত্র ভয়ানক অবক্ষয় কবলিত জনপদ, প্রাণের স্বজনহারার অভিশাপের অনলে দগ্ধ শ্যামলিমা বঙ্গজননী আমার। গভীর অন্ধকার এক তাড়িয়ে বেড়ায় প্রাণের বাংলাকে– তখন ভয়ঙ্কর অধঃপতন ও অবক্ষয়ের ঘোর অন্ধকার থেকে বাঙালি আবার জেগে ওঠার শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করল বঙ্গবন্ধুকন্যার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। তাঁর শুভ আগমনে বঙ্গবন্ধুকে হারাবার শোক শক্তিতে পরিণত হলো, বাঙালি আবার ফিরে পেল তাদের হারানো অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ্য নেতাকে। আজ সে নেতার সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনায় বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উপনীত হয়েছে। ভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনেও সফল হবেন দেশরত্ন শেখ হাসিনা। তিনিও সব সময় বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার বীরত্বপূর্ণ অবদানের কথা, দেশপ্রেমে তাঁদের অসামান্য আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা দেশবাসীর সামনে অত্যন্ত তাৎপর্যের সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁদের সে অমূল্য অবদানের অসীম ঋণ স্বীকারও করে থাকেন বিভিন্ন সভা সমাবেশে, সেমিনারে ভীষণ অহমের সাথে।

বাঙালির অধিকার আদায়ের এক ঝড়ক্ষুব্ধ উত্তাল দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি এক আনন্দ উল্লাসধ্বনির মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে সম্মানিত করা হলো। সেই দিন থেকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রাণিত হলেন বঙ্গজননীর হাজার বছরের লালিত স্বপ্নের মহৎপ্রাণ প্রমিথিউস। অতি আদরের শ্রদ্ধার 'মজিব ভাইয়ের' জয় বাংলা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলো পরম ভালোবাসার গর্বিত শব্দ 'বঙ্গবন্ধু'। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শব্দগুচ্ছ হলো পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র উচ্চারণ। কারণ যে শব্দের মানবিক আকর্ষণ আর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ভয়কে জয়ের বীরদীপ্ত প্রত্যয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বাংলা মায়ের স্বাধীনতার জন্য জীবন করল দান। যে জাতির প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

সেখান থেকে তিনি ধীরে ধীরে বীর বাঙালির মুক্তির একমাত্র ঠিকানায় পরিণত হলেন– মহান সৃষ্টিকর্তার অফুরন্ত রহমতের ঝরনাধারায় আর গণমানুষের বিশ্বাস পরম ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু দৃঢ়প্রত্যয়ে ঘোষণা করলেন পাকিস্তানি স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর সকল অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দৃঢ় অঙ্গীকারে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অহিংস অভিযানের দূরদর্শী প্রাজ্ঞ, চিন্তা-চেতনায় প্রাণের নেতা বঙ্গবন্ধু– 'জাতির পিতা' খেতাবে উদ্ভাসিত হলেন এক অসাধারণ গৌরবদীপ্ত ঔজ্জ্বল্যে। সে আনন্দঘন মুহূর্ত ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে। সেদিন থেকে ভিন্নমাত্রায় বীরত্বপূর্ণ অহংকারে যাত্রাপথ শুরু করলেন শোষিত-বঞ্চিত-নির্যাতিত গণমানুষের অভিভাবকরূপে এক অসামান্য কৃতিত্বের স্বপ্নসাধনায়। যার আকাশচুম্বি উত্থানের ভালোবাসার সাম্পানে ভাসে মনের গভীরে লুকানো সোনালি পায়রা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের সকলের অঙ্গীকার হবে জয় বাংলার জয় বঙ্গবন্ধুর পবিত্র ভূমিতে আর যেন কখনো কোনো স্বাধীনতাবিরোধী– মাটি ও মানুষের দুশমনদের বীভৎস নষ্ট আস্ফালনে রক্তাক্ত না হয়। সে দিকে সবার সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সবাইকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধশালী শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ রাষ্ট্র বিনির্মাণে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। যদিও বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশকে নানাভাবে অলীক অপবাদ ও বদনাম রটানোর ষড়যন্ত্র আজো অব্যাহত রয়েছে। এসব কিছুকে উপেক্ষা করে বাংলার বীর তারুণ্য বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শ মনেপ্রাণে ধারণ করলে শতভাগ সফল হবে দেশ ও দেশের জনগণ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলায় থাকবে না কোনো জঙ্গি সন্ত্রাসী অপকর্ম, থাকবে না নারী ও শিশু নির্যাতন। এক অসাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন সাম্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে বাঙালির চিরকালীন সৃজনসাধনা সফল হলে আমরা সকলে একসঙ্গে গেয়ে উঠব– মা তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন জলে ভাসি।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও ক্ষুদ্রপ্রাণ মুজিব সৈনিক

বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

মুহাম্মদ ইসমাঈল

১০ই জানুয়ারি, ২০২০ বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুজিবর্ষের ক্ষণগণনা। তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে (জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড) ৪৮ বছর আগে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপ্রবাহ রেপ্লিকার সাহায্যে প্রতীকী মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এ ক্ষণগণনার সূচনা হয়। মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর উদ্‌বোধনের পর প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও সকল পাবলিক প্লেসে একইসঙ্গে ক্ষণগণনা শুরু হয়। সারা দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের ২৮টি পয়েন্টে, বিভাগীয় শহরগুলো, ৫৩টি জেলা ও দুই উপজেলা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীতে মোট ৮৩টি পয়েন্টে ক্ষণগণনার ঘড়ি বসানো হয়েছে। ক্ষণগণনা শেষে ১৭ই মার্চ, ২০২০ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে সূচনা হবে মুজিববর্ষের বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও থাকবে নানা আয়োজন।

বঙ্গবন্ধুর জীবনপঞ্জি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো–

১৯২০, ১৭ই মার্চ: গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।

১৯২৭: সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতির পিতার প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রজীবনের সূচনা হয়।

১৯২৯: বঙ্গবন্ধুকে গোপালগঞ্জ সীতানাথ একডেমির (বা পাবলিক স্কুলে) তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়।

১৯৩৪: মাদারীপুরে ইসলামিয়া হাইস্কুলে পড়ার সময় বঙ্গবন্ধু বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন।

১৯৩৭: অসুস্থতার কারণে বঙ্গবন্ধুর লেখাপড়া বন্ধ ছিল, আবার তা শুরু।

১৯৩৮, ১৬ই জানুয়ারি: বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শনে এলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

১৯৩৯: সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা করার দুঃসাহসের কারণে বঙ্গবন্ধু প্রথম কারাবরণ করেন।

১৯৩৮: মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি বেগম ফজিলাতুন নেছার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৪২: অসুস্থতার কারণে একটু বেশি বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু এন্ট্রাস (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বছরেই কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজের বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষে তিনি থাকতে শুরু করেন।

১৯৪৪: কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান করেন। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি রাজনীতিতে অভিষিক্ত হন। এই বছরই ফরিদপুর এসোসিয়েশনের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৪৬: বঙ্গবন্ধু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলকাতা ইসলামিক কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহকারী নিযুক্ত হন। এই বছরই প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৭: বঙ্গবন্ধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন।

১৯৭৪, ৬ই সেপ্টেম্বর: ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুব কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৮: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৭৮, ২৩শে ফেব্রুয়ারি: তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেন।

১৯৪৮, ২রা মার্চ: রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৪৮, ১১ই মার্চ: রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বানকালে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন।

১৯৪৮, ১৫ই মার্চ: বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পান।

১৯৪৮, ১১ই সেপ্টেম্বর: ফরিদপুরের কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য বঙ্গবন্ধু আবার গ্রেফতার হন।

১৯৪৯, ২১শে জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পান।

১৯৪৯, ৩রা মার্চ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু তার প্রতি সমর্থন জানান।

১৯৪৯, ২৯শে মার্চ: আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুকে অযৌক্তিকভাবে জরিমানা করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার প্রতি সমর্থন জানান।

১৯৪৮, ২০শে এপ্রিল: বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সৃষ্ট আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৪৯, ২৩শে জুন: পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪৯, ২৭শে জুলাই: বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে না গিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

১৯৪৯: পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হলে খাদ্যের দাবিতে তিনি আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৫০, ১লা জানুয়ারি: এই আন্দোলনের কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫২, ১৪ই ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বঙ্গবন্ধু কারাগারে অনশন শুরু করেন।

১৯৫২, ২১শে ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ মিছিলে গুলি চলে। শহিদ হন– সালাম, রফিক, জব্বার ও বরকতসহ অনেকে। জেল থেকে বঙ্গবন্ধু এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন এবং একটানা তিনদিন অব্যাহত রাখেন।

১৯৫২, ২৭শে ফেব্রুয়ারি: টানা অনশনে অসুস্থ বঙ্গবন্ধুকে স্বাস্থ্যগত কারণে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৫৩, ১৬ই নভেম্বর: প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলীম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৩, ৪ঠা ডিসেম্বর: প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সব বিরোধী দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।

১৯৫৪, ১০ই মার্চ: সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে বিজয়ী হয়। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে বিজয়ী হন।

১৯৫৪, ২রা এপ্রিল: যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

১৯৫৪, ১৪ই মে: বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৫৪, ৩০শে মে: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। বঙ্গবন্ধু এ দিনই করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেফতার হন।

১৯৫৪, ২৩শে নভেম্বর: বঙ্গবন্ধু জামিনে মুক্তি পেলে জেল গেটেই তাঁকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫৪: বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পান।

১৯৫৫, ৫ই জুন: বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৫, ১৭ই জুন: ঢাকার পল্টনের জনসভা থেকে বঙ্গবন্ধু প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন।

১৯৫৫, ২১শে অক্টোবর: আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করে নতুন নামকরণ করা হয় 'আওয়ামী লীগ' বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৮, ৭ই অক্টোবর: জাতীয় সংসদের ডেপুট স্পিকার শাহেদ আলীর ওপর আক্রমণ এবং তার মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন।

১৯৫৮, ১২ই অক্টোবর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। এসময় তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়।

১৯৫৯, ৫ই অক্টোবর: বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান কিন্তু তাঁর গতিবিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এসময় তিনি বার বার গ্রেফতার হন এবং ছাড়া পান।

১৯৬২, ২রা জুন: চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ই জুন শেখ মুজিব মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৪, ২৫শে জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধুর বাস ভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

১৯৬৪, ৫ থেকে ১১ই মার্চ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী 'দাঙ্গা প্রতিরোধ' কমিটি গঠিত হয়।

১৯৬৫: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে COP-এর পক্ষ থেকে মিস ফাতিমা জিন্নাহকে প্রার্থী দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন আগে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৬, ১৮ই মার্চ: আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ছয় দফা গৃহীত হয়। এরপর তিনি ছয় দফার পক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বার বার গ্রেফতার করা হয়। ৩ মাসে তিনি ৮ বার গ্রেফতার হন। শেষ বার তাঁকে গ্রেফতার করে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়।

১৯৬৮, ৩রা জানুয়ারি: পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সিনিয়র ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।

১৯৬৮, ২৮শে জানুয়ারি: নিজেকে নির্দোষ দাবি করে আদালতে লিখিত বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি পড়ে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও তাঁর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ছাত্রসমাজ ছয় দফার সমর্থনে ১১ দফা দাবি উপস্থাপন করে।

১৯৬৯, ৩০শে জানুয়ারি: উদ্ভূত পরিস্থিতি ঠেকাতে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব দেয় পাকিস্তানি জান্তা সরকার। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সে প্রস্তাব ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করেন।

১৯৬৯, ১৫ই ফেব্রুয়ারি: ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে মামলার অন্যতম আসামি সাজেন্ট জহুরুর হককে নির্মমভাবে হত্যা করা হলে বিক্ষুব্ধ জনতা বাধভাঙা বন্যার মতো রাস্তায় নেমে আসে।

১৯৬৯, ২২শে ফেব্রুয়ারি: তীব্র গণআন্দোলনের মুখে সরকার 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' শিরোনামে মিথ্যা মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়।

১৯৬৯, ২৩শে ফেব্রুয়ারি: ডাকসু এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে এক বিশাল সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করে। ঐ সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৬৯, ১০ই মার্চ: রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। গোলটেবিলে ছয় দফার পক্ষে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় অবস্থান নেন। তবে ঐ বৈঠক ব্যর্থ হয়।

১৯৬৯, ২৫শে মার্চ: রাওয়ালপিন্ডি গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবার পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া সামরিক শাসন জারি করেন।

১৯৬৯, ২৮শে নভেম্বর: জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭০-এর ১লা জানুয়ারি থেকে কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। ঐ বছরের শেষ ভাগে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও ঘোষণা করেন।

১৯৭০, ১লা জানুয়ারি: ১৯৫৮ সালের পর প্রথম রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। বঙ্গবন্ধু প্রথম দিন থেকেই ছয় দফার পক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেন।

১৯৭০, ৪ঠা জুন: নির্বাচনকে সামনে রেখে মতিঝিল ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৭০, ৫ই জুন: পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনি এলাকা বিষয়ে সরকারের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসন আর জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসন নির্দিষ্ট করা হয়।

১৯৭০, ১৫ই আগস্ট: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন যথাক্রমে ৭ ও ১৭ই ডিসেম্বর।

১৯৭০, ৮ই অক্টোবর: ইসলামাবাদ থেকে ১৯টি রাজনৈতিক দলের প্রতীক ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। আওয়ামী লীগকে 'নৌকা' প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। স্মরণীয় যে, ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচন যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা।

১৯৭০, ২৮শে অক্টোবর: বঙ্গবন্ধু বেতার ও টেলিভিশনে নির্বাচনি ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েই আওয়ামী লীগের জন্ম। তাঁর সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ'। তিনি দেশবাসীর কাছে ছয় দফার পক্ষে ম্যান্ডেট চান।

১৯৭০, ১২ই নভেম্বর: পূর্ব বাংলায় ভয়াবহ ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসে

১০/১২ লাখ মানুষ মারা যান। বঙ্গবন্ধু তাঁর নির্বাচনি প্রচারণা স্থগিত করে ত্রাণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি এই অঞ্চলের জনগণের প্রতি চরম উদাসীনতা তুলে ধরেন। এই সময় 'সোনার বাংলা শশ্মান কেনো' শিরোনামে তথ্যসংবলিত একটি পোস্টার জাতিকে নাড়া দেয়।

১৯৭০, ৭ই ডিসেম্বর: বন্যা দুর্গত এলাকা বাদে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন পায়।

১৯৭০, ১৭ই ডিসেম্বর: প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ২৯৮টি আসন লাভ করে।

১৯৭১, ৩রা জানুয়ারি: আওয়ামী লীগের সকল নির্বাচিত সদস্য ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন তথা ছয় দফা বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ করেন। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' এই রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন হয়। বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে বাঙালি জাতির মুক্তির সংকল্প ব্যক্ত করেন। শপথ অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধনী সংগীতের পর 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটি পরিবেশিত হয়।

১৯৭১, ১০ই জানুয়ারি: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তিন দফা বৈঠক করেন। চার দিন পর ফিরে আসার সময় তিনি বলেন, 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন'।

১৯৭১, ২৭শে জানুয়ারি: জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেন। কিন্তু ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়।

১৯৭১, ১৩ই ফ্রেব্রুয়ারি: এক সরকারি ঘোষণায় বলা হয় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় ৩রা মার্চ ১৯৭১ সালে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

১৯৭১, ১লা মার্চ: জাতীয় পরিষদ অধিবেশনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের সংসদীয় বৈঠক শুরু হয় হোটেল পূর্বানীতে। ওই দিনই আকস্মিকভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। সারা বাংলায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রে পরিণত হয় রাজপথ। বঙ্গবন্ধু এটাকে শাসকদের আরেকটি চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করেন। তিনি ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করেন।

১৯৭১, ২রা মার্চ: ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। উত্তাল ঢাকা পরিণত হয় বিক্ষোভের শহরে। জান্তা সরকার ঢাকা শহরের পৌর এলাকায় সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারফিউ জারি করেন।

১৯৭১, ৩রা মার্চ: বিক্ষুব্ধ জনতা কারফিউ উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে। সামরিক জান্তার গুলিতে মারা যান ৩ জন, আহত হন কমপক্ষে ৬০ জন। এই সময় পুরো দেশ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে।

১৯৭১, ৭ই মার্চ: বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক যুগান্তকারী ভাষণে ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে স্পষ্ট হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। সারা দেশে শুরু হয় এক অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন।

১৯৭১, ১৬ই মার্চ: বিস্ফোরণমুখী বাংলাদেশে আসে ইয়াহিয়া খান। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে হেয়ার রোডে প্রেসিডেন্ট ভবনে আলোচনার জন্য যান।

১৯৭১, ১৭ই মার্চ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম জন্মদিন। এই দিন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনা থেকে ফিরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এদেশে জন্মদিনই বা কী আর মৃত্যু দিনই বা কী– আমার জনগণই আমার জীবন।'

১৯৭১, ২৩শে মার্চ: কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিরোধ দিবস পালনের ঘোষণা দেন। সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি ভবনে 'বাংলাদেশের' জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু এদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

রাজশাহী সফরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৫৪

১৯৭১, ২৫শে মার্চ: পৃথিবীর ইতিহাসে এক নৃশংসতম কালোরাত্রি ২৫শে মার্চ। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে মানুষের ঢল নামে। সন্ধ্যায় খবর পাওয়া যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেছেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আর সাড়ে এগারোটায় শুরু হয় 'অপারেশন সার্চ লাইট'। ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা।

১৯৭১, ২৬শে মার্চ: ১২-৩০ মিনিট ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হবার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাবার্তা ওয়্যারলেস যোগে চট্টগ্রামের জহুরুল আহমেদ চৌধুরীকে প্রেরণ করেন। চট্টগ্রাম বেতার থেকে আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী স্বকণ্ঠে প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৭১, ২৭শে মার্চ: বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে বীর বাঙালি গড়ে তোলে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

১৯৭১, ১৭ই এপ্রিল: তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার ভবের পাড়ার (বৈদ্যনাথ তলা) আমবাগানে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী

তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন। আজ থেকে (১৭ই এপ্রিল) বৈদ্যনাথ তলার নাম 'মুজিব নগর' এবং অস্থায়ী রাজধানী মুজিব নগর থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়।

১৯৭১, ২৫শে মে: ক্রমেই মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হতে শুরু করে। সংগঠিত হয় প্রবাসী সরকার। ২৫শে মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়। এই কেন্দ্রের সিগনেচার টিউন ছিল 'জয় বাংলা বাংলার জয়'। কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারিত হতে থাকে। এই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'শোন একটি মুজিবুরের কণ্ঠে...' গানটি বাঙালির উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেয়।

১৯৭১, ৩রা আগস্ট: পাকিস্তান টেলিভিশন থেকে বলা হয় ১১ই আগস্ট থেকে সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হবে। এই ঘোষণায় বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ এবং উদ্বেগের ঝড় বয়ে যায়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রবাসী বাঙালিরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী সন ম্যাকব্রাইডকে ইসলামাবাদে পাঠান। কিন্তু পাকিস্তানি জান্তা সরকার বিদেশি আইনজীবী নিয়োগে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

১৯৭১, ১০ই আগস্ট: পাকিস্তানি জান্তা সরকার বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সমর্থনের জন্য আইনজীবী একে ব্রোহীকে নিয়োগ দেয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে যখন ২৬শে মার্চ ইয়াহিয়া খানের ভাষণের টেপ শোনানো হয় তখন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকার করেন এবং ব্রোহীকে অব্যহতি দেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরি হয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবতা স্পর্শ করতে থাকে।

১৯৭১, ১১ই নভেম্বর: বঙ্গবন্ধুকে ইয়াহিয়া খানের সামনে হাজির করা হয়। ইয়াহিয়ার সঙ্গে ছিলেন ভুট্টো এবং জেনারেল আকবর। ইয়াহিয়া করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালে বঙ্গবন্ধু বলে 'দুঃখিত ও হাতে বাঙালির রক্ত লেগে আছে ও হাত আমি স্পর্শ করব না'। এ সময় অনিবার্য বিজয়ের দিকে এগুতে থাকে আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।

১৯৭১, ২রা ডিসেম্বর: বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের মুক্তির সংগ্রাম যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন লায়লাপুর কারাগারে ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ঐ সমঝোতা প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৭১, ১৬ই ডিসেম্বর: ত্রিশ লাখ শহিদ এবং দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আসে আমাদের বিজয়। বাঙালি জাতি মুক্ত হয় পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে। কিন্তু মুক্তির অপূর্ণতা রয়ে যায় স্বাধীনতার স্থপতি তখন নির্জন কারাগারে।

১৯৭২, ৩রা জানুয়ারি: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে ঘোষণা করেন 'শেখ মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হবে'।

১৯৭২, ৮ই জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পান। পিআইয়ের একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনে পাঠানো হয়। ৮ই জানুয়ারি ভোরে বঙ্গবন্ধু লন্ডনে পৌঁছেন। তাঁর হোটেলের সামনে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন 'আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই'।

১৯৭২, ১০ই জানুয়ারি: সকালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের আগ্রহে ব্রিটেনের রাজকীয় বিমানবাহিনীর এক বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু নয়াদিল্লি পৌঁছালে রাষ্ট্রপতি ভি.ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'অশুভের বিরুদ্ধে বিজয় হয়েছে'। ওই দিন বিকেলে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। লাখো মানুষের জনস্রোত, বাঁধভাঙা আবেগে অশ্রুসিক্ত জাতির পিতা বলেন, 'আজ আমার জীবনের স্বাদপূর্ণ হয়েছে'। ওই দিন জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু হৃদয়কাড়া এক ভাষণ দেন। ওই রাতেই তিনি রাষ্টপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৭২, ১২ই জানুয়ারি: দেশে রাষ্ট্রপতি শাসনের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন কাঠামো প্রবর্তন করে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

১৯৭২, ১২ই মার্চ: স্বাধীনতার মাত্র ৫০ দিনের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়।

১৯৭২, ২৬শে মার্চ: শোষণহীন সমাজ গঠনের অঙ্গীকারের মধ্যে দিয়ে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

১৯৭২, ২০শে এপ্রিল: শুরু হয় গণপরিষদের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।

১৯৭২, ৪ঠা নভেম্বর: গণপরিষদে বাংলাদেশের খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। এ উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বিজয়ের নয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেওয়া, মানুষের মৌলিক দেওয়ার অর্থ হলো 'জনগণের উপর বিশ্বাস করি'।

১৯৭২, ১৬ই ডিসেম্বর: নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়। বাতিল করা হয় গণপরিষদ।

১৯৭২, ৭ই মার্চ: নতুন সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতির পিতার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ ৩০০টির মধ্যে ২৯২টি আসনে বিজয়ী হয়।

১৯৭৩, ৩রা সেপ্টেম্বর: আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়।

১৯৭৪, ২৩শে সেপ্টেম্বর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাঙালি নেতা হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন।

১৯৭৫, ২৫শে জানুয়ারি: দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস করেন। এই বিলের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৭৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রপতি এক ডিগ্রির মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সম্মিলনে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামে একটি নতুন একক রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

১৯৭৫, ১৫ই আগস্ট: স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহিদ হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাংলাদেশ নামে এই মানচিত্রের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বপ্নের রূপকার। এই একটি সাফল্যই যথেষ্ট বঙ্গবন্ধুর অমরত্বের জন্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কেবল জাতির পিতা ছিলেন না, এই রাষ্ট্র বিনির্মাণে ধাপে ধাপে রয়েছে তাঁর বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা ও মেধা। বঙ্গবন্ধু মানে ইতিহাস। তাই বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে বার বার ফিরে আসবে। জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিরন্তর। তাঁর কীর্তি ও অবদান বলে শেষ করার নয়। তাঁর নাম বাংলার মাটিতে, বাংলার জাতিসত্তায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন।

লেখক: শিক্ষক ও সাহিত্যিক

ঋতুস্নান

সেলিনা হোসেন

আমার নাম মারসাই। ছোট্ট করে সবাই ডাকে মার্সি। আমি আমার নাম নিয়ে খুশি। নানাকিছু আমার পছন্দের মতো হলেই আমি খুশি থাকি। আমার চাহিদার বাড়াবাড়ি নেই।

আমি রাখাইন সম্প্রদায়ের মেয়ে। কতকাল আগে আমার পূর্বপ্রজন্মের মানুষেরা এখানে এসে বসতি করেছিল সেসব গল্প আমার দাদু-দিদিমা জানতো। দাদু বলত, যারা এখানে প্রথমে এসেছিল তারা এখানে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি শুরু করেছিল। বাবা-মা বলে, এখন এই বসতির ঠিকানা পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের কড়চাপাড়া গ্রামে।

আমি এই গ্রামটির নাম নিয়ে খুশি। অন্য গাঁয়ে গেলে কেউ যদি আমার গাঁয়ের নাম জিজ্ঞেস করে তখন আমি বেশ জোরেসোরে গাঁয়ের নাম বলি। কেউ কেউ বলে, মেয়েটা একটা পাগল। নিজের গ্রাম নিয়ে এত খুশি হওয়ার কী আছে! আমি কাকে বোঝাবো যে খুশি হওয়ার কত কিছু আছে। আমি বেশি খুশি যে এটা আমার দিদিমার গ্রাম। বিয়ের পরে দাদু তাঁর শ্বশুরবাড়িতে থাকতে আসেন। এটা মাতৃসূত্রীয় রাখাইনদের সামাজিক নিয়ম। বিয়ে হলে ছেলেকে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হবে। আমার দাদু-দিদিমা বেশ সুখেই সংসার করেছেন। দিদিমার বাবা তাদেরকে বত্রিশ বিঘা মাঠান জমি দিয়েছিলেন। দাদু নিজে কৃষিকাজ দেখতেন। ঘরে ফসল ওঠাতেন। দিদিমা সেগুলো যত্ন করে সঞ্চয় করতেন। সারা বছর ঘরে কোনো অভাব থাকত না। আমার মা খুশির স্বরে সেসব দিনের কথা গল্প করতেন। তারা দুই বোন দুই ভাই ছিলেন।

আমি যখন দিদিমার আদর বুঝতে শিখি তখন তার বেশ বয়স হয়েছিল। তারচেয়েও বেশি তার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল সাগরের ঝড়ে দুই সন্তান হারিয়ে।

দিদিমা এমন করে গল্পটা বলতেন আমাকে, জানিস সেদিন সাগর খুব রেগে গিয়েছিল।

আমার দু'চোখে বিস্ময় জমা হতো। জিজ্ঞেস করতাম, সাগর কেমন করে রেগে যায় দিদিমা? দাদু যেমন রেগে যায় তেমন?

তারচেয়েও বেশি। তোর দাদুর রাগের চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি রাগ থাকত সাগরের।

সেদিন সাগর কেন রাগ করেছিল দিদিমা?

আমি জানি না। বোধহয় আমাদের কোনো পাপ ছিল।

পাপ? মানুষের পাপের জন্য সাগর রাগবে কেন?

মানুষ যদি সাগরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে সাগরতো রাগবেই।

এভাবেই দিদিমার সঙ্গে গল্প শুরু হতো। তারপর দিদিমা বলতেন সাগরের সেই ঝড়ে কেমন করে তছনছ হয়ে গিয়েছিল দাদু-দিদিমার সংসার।

সেই ঝড়ে দিদিমা হারিয়েছিল তার বড়ো মেয়ে আর ছোটো ছেলেকে। আমার মাকে পেয়েছিল পাশের গ্রামে। আর মামাকে পেয়েছিল আমাদের গাঁয়েরই অন্য ধারে। দাদু আটকে ছিল গাছের ডালে। দিদিমা সাগরসৈকতে পড়েছিলেন। অনেক পরে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল।

আমি ভয়ে কুঁকড়ে থেকে বলি, এটা কি দৈত্য-দানবের গল্প দিদিমা?

দিদিমা চুপ করে থেকে বলতেন, না মানুষের পাপের গল্প।

তুমি বারবার মানুষের পাপের কথা বলো কেন দিদিমা?

দিদিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে। তারপর নিজে নিজেই বলে, এটা আমার মনে হয় দাদু। মানুষই সাগরকে খেপায়। এই ধরো সাগরে বড়ো বড়ো জাহাজ ভাসায়। সাগরের জল নষ্ট করে। সাগরের মাছগুলো ধরে ফেলে– এইসব দাদু, এইসব। এইসবই আমার মনে হয়। আমাদের অনেক পাপ জমেছে।

এরপরে দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার মেয়ের মরদেহ দেখে

ওকে চিনতে পারিনি। চিনেছিলাম কানের ফুল আর গলার চেন দেখে। ছেলেটিকে চেনার উপায় ছিল না। গাঁয়ের লোকে বলেছিল, এটা আপনারই ছেলে। আমিও মেনে নিলাম। বললাম, হোক। ও আমার ছেলেই হোক। তবুতো আমার কাছে ফিরে এসেছে। সাগর আমাকে বলেছে, ওকে বুকে নাও।

আমি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলি, দিদিমা তোমার অনেক কষ্ট, না?

হ্যাঁ রে, আমার বুকভরা কষ্ট।

আমি বলি, তোমাদেরকে আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হয়েছিল?

আমরা সব হারিয়েছিলাম। ধানের গোলা, গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি, গাছগাছালি। এমনকি আমাদের ঘর-দুয়োরও ভেসে গিয়েছিল দাদু। তোর মা আর মামা আমাদের কোলে ছিল বলে আমরা নতুন করে শুরু করেছিলাম। আমাদের ভাঙা বুক জোড়া লাগিয়েছিল।

সেই বড়ো ঝড়ের পরে আমাদের পাড়ায় আটঘর রাখাইন পরিবার ছিল। তাদেরই পূর্বমানুষেরা এখানে জঙ্গল কেটে বসতি করেছিল। দাদু-দিদিমা বলতেন, বাঙালিরা রাখাইনদের জায়গা-জমি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য শাসাতো। বলত, তোমরা বার্মা থেকে এসেছ, বার্মায় চলে যাও। আমরা এখানে থাকব।

দাদু বলতেন, জায়গাটাতো আমরাই থাকার জন্য তৈরি করেছি। তখনতো তোমরা এখানে বাস করতে না। যখন আমরা এসেছিলাম তখন আমাদের ন্যাংটো থাকতে হয়েছে। বনের ফলমূল খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। তোমরাতো এভাবে থাকনি। আমরা বসতির জন্য জায়গা তৈরি করার পরে তোমরা বাস করতে এসেছ। এখন আমাদের যেতে বলছ কেন? আমরাতো তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি।

আমি নিজেদের ইতিহাসের কথা শুনতে ভালোবাসতাম। নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতির গৌরবের জন্য আমার খুব গর্ব ছিল। হতে পারি আমরা একটি ছোটো নৃগোষ্ঠী, কিন্তু আমাদের বড়ো জাতি হওয়ার সবকিছু আছে। শুধু আমাদেরকে সংখ্যায় বাড়তে হবে।

দিদিমা বলতেন, এখানে আমরা একটা বড়ো দল এসেছিলাম। কিন্তু জঙ্গল কেটে বসতি বানাতে গিয়ে অনেক লোক মারা গেছেন। ছোটোরা খেতে না পেয়ে মারা গেছে। অনেকে হিংস্র জীবজন্তুর মুখে প্রাণ দিয়েছে। আমাদেরকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল রে নাতনি। এখন বাঙালিরা আমাদেরকে হুমকি দেয়। জায়গা ছেড়ে দিতে বলে। আমাদের জমি দখল করে নিতে চায়।

তোমরা প্রতিবাদ করনি দিদিমা?

করিনি আবার, করেছি। কিন্তু ওরা সংখ্যায় বেশি। এজন্য ওদের সঙ্গে আমরা পারিনি। ওরা আস্তে আস্তে আমাদেরকে কোণঠাসা করেছে। এখন একদম শেষ করতে চায় রে নাতনি।

দিদিমাদের কাছে শুনেছিলাম বাঙালিদের চাপে সে সময়ে আটঘর পরিবারের ছয়ঘরই সামান্য দামে জমিজমা বিক্রি করে চলে গিয়েছিল। আট বিঘা জমির সমান ছিল এক কানি– মাত্র একশ-দুশ টাকায় সেসব জমি বিক্রি করে দিতে হয়েছিল ওদের।

ওরা চলে গিয়েছিল কেন দিদিমা?

ভয় পেয়েছিল। ভয়ে চলে গিয়েছিল। দেশে গিয়েও ওদের কোনো শান্তি ছিল না। পরে শুনেছিলাম।

তোমরা ওদেরকে যেতে না করনি কেন?

করেছিলাম। শোনেনি। ওদের চলে যাওয়া দেখেছিলাম। আর কেঁদেছিলাম।

তোমরা ভয় পাওনি কেন দিদিমা?

তোর দাদু আর আমি ঠিক করেছিলাম যে আমরা এখানেই থাকব। আমাদের যা হয় হবে। এই মাটিতো আমাদের দাদু-দিদিমা তৈরি করেছিল। তাহলে এটা আমাদেরই মাটি। আমরা ছাড়ব না। থাকার জন্য লড়ে যাব।

বাহ, তোমরাতো খুব সাহসী ছিলে।

হ্যাঁ, আমরা খুব সাহস করেছিলাম রে নাতনি। আমাদের সঙ্গে রামদা থাকত। রাতে বর্শা নিয়ে ঘুমাতাম। কাউকে পরোয়া করতাম না। যারা আমাদের পিছে লেগেছিল তারা আমাদের সাহস দেখে বেশি ঘাটায়নি আর। তাছাড়া অনেক বাঙালি পরিবার আমাদের পক্ষে ছিল। ওরা আমাদের হয়ে শয়তানদের সঙ্গে ঝগড়া করত।

আমি দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে বলতাম, তোমরা ঠিক কাজটি করেছিলে দিদিমা।

আমি ওদের পরিষ্কার বলেছিলাম, আমাদের জমি নিতে হলে আমাদের রক্তে পা ধুয়ে নিতে হবে। পারবেন, রক্তে পা ডোবাতে?

ওরা থমকে যেত। কথা বাড়াত না। শেষদিকে আমাদের সঙ্গে লাগা বন্ধ করেছিল।

তারপর একদিন দাদু মরে যায়।

হ্যাঁ। দিদিমা উদাস হয়ে যেতেন। বলতে পারতেন না যে দাদুকে ছাড়া তার দিনগুলো কেমন কেটেছে। শুধু বলতেন, লড়াই লড়াই। আর আমি বলতাম সেই সঙ্গে সাহস।

হ্যাঁ, সাহস সাহস। মনে করেছিলাম, মরতেতো হবেই। সাহস নিয়ে মরবো। হার মানব না।

দিদিমার টিকে থাকার গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগতো। নিজেকে একটি সাহসী মেয়ে হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল আমার। একদিন দিদিমা মরে গেলেন। কেঁদে বুক ভাসালাম। দিদিমাকে প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম। মাঝে মাঝে মনে হতো দিদিমা আমার কাছে বসে আছেন। আমার হাতটা তুলে নিজের গালে বুলিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন, বেঁচে থাকা একটা লড়াই নাতনি। আমার ঘুম ভেঙে গেলে আমি বালিশে মুখ ঘষতাম। মনে হতো বালিশের কোথাও দিদিমা আছে। আমি তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি।

আমার বাবা-মাও সাহসী মানুষ। বলেন, আমরা হার মানব না। এ মাটিতেই থাকব। নিজেদের সম্প্রদায়কে বড়ো করে তুলব।

আমরা দুই বোন, এক ভাই। আমি বড়ো। আমাদের নিয়ে বাবা-মায়ের সংসার ভালোই কাটছিল। খুব বেশি অভাব ছিল না। বাবা কৃষিকাজ করতেন। মাও নানারকম কাজ করে আয় করতেন। আমাদের স্কুলে পাঠাতেন। আমরা লেখাপড়া শিখে বড়ো হবো– এমন ইচ্ছে ছিল তাদের। আমরা তিন ভাইবোন মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতাম।

কিন্তু গ্রামের লোভী কয়েকজন বাঙালি বাবাকে চলে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করত। আমাদের গরু-ছাগল ধরে নিয়ে যেত। গাছ কেটে ফেলত। এসব নির্যাতন বাবা-মা মুখ বুঁজে সইতেন না। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে নালিশ দিতেন। সালিশ বসত। কখনো মিটমাট হতো, কখনো হতো না। এসবের মধ্যেই আমাদের দিন কাটছিল।

আমার বাবা-মাকে ভিটে ছাড়াতে পারেনি সন্ত্রাসীরা। দুজনেই দিদিমার মতো সাহসী ছিলেন। ওদেরকে বলে দিয়েছিলেন, যা খুশি করতে পার, কিন্তু আমাদের নড়াতে পারবে না।

ওরা বাবাকে নানাভাবে হয়রানি করত। জমি দখলের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এগারো বার মামলা করেছিল ওরা। কিন্তু আদালতে বাবার পক্ষে রায় হয়। দুষ্টু লোকেরা বাবার সঙ্গে পেরে উঠত না। বাবা মামলায় জিতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছি। হাইস্কুলে যেতে শুরু করি। বখাটে ছেলেরা আমাকে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে।

ওই মার্সি, ওই মাছি–

পেছন থেকে এভাবে টিস করত, আমাকে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে হি-হি করে হাসতো।

কখনো শুনতাম, তোমাকে ভালোবাসি মার্সি। একবার তাকাও

আমার দিকে। তোমাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে রাখব।

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যেত। আমি মাথা নিচু করে হেঁটে কোনোরকমে স্কুলে পৌছাতাম। ওরা মাঝে মাঝে খুব খারাপ ভাষায় কথা বলত। ভয়ে আমার পা কাঁপতো ঠকঠক করে। আমি দৌড়াতেও ভুলে যেতাম। ডাক ছেড়ে কাঁদতাম। আশপাশের দু'একজন জিজ্ঞেস করতো–কী হয়েছে তোমার? আমি কারও কথার উত্তর দিতাম না। তারপর একসময় দৌড়াতে শুরু করতাম। একদিন এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি পৌছে দেখলাম আমার পা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। আমি চিৎকার করে মাকে ডাকি। কাঁদতে কাঁদতে বলি, মা দেখ আমার কি হয়েছে।

মা ছুটে এসে আমাকে দেখেন। আমি পাগলের মতো লাফাতে থাকি।

মা মৃদু ধমক দিয়ে বলেন, দাঁড়া না, দেখি কী হয়েছে। কোথাও পড়ে গিয়েছিলি?

না, কোথাও পড়ে যাইনি। ব্যথা পাইনি। আমার কোথাও কেটে যায়নি মা। আমার কিছুই হয়নি মা। শুধু ওই শয়তানগুলোর ভয়ে আমি দৌড় দিয়েছি।

আয়, ঘরে আয়। বুঝতে পেরেছি এটা তোর জীবনের প্রথম রক্ত।

প্রথম রক্ত? প্রথম রক্ত কী মা?

তুমি ঋতুমতী হয়েছ মা।

ঋতুমতী? এটা আবার কী?

তুমি বড়ো হয়েছ।

বড়ো? কত বড়ো? আমার বয়সতো বারো বছর। বারো বছর বয়সে একটি মেয়ে কত বড়ো হতে পারে? আমিতো এখনো ছেলেদেরকে ভয় পাই। আমি বড়ো হলে ছেলেদেরকে আর ভয় পাব না মা।

বুঝেছি, তুই তোর দিদিমার মতো সাহসী মেয়ে। আয় ঘরে আয়। তোকে এখন অনেক কিছু শিখতে হবে।

ঋতুমতী হলে কী হয় মা?

মেয়েরা মা হয়। মেয়েদের মা হওয়ার বয়স হয়।

আমি বিড়বিড় করি, মা হওয়ার বয়স হয়, মা হওয়ার বয়স হয়। তাহলেতো আমি অনেক বড়ো হয়েছি। অনেক বড়ো হয়েছি– আকাশের সমান বড়ো। সাগরের মতো বড়ো। সাগরের একটা বড়ো ঝড় এলে আমাকে কিছুতেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

আনন্দে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি।

মা আমাকে কত কিছু বোঝাচ্ছেন। আমি তাঁর কথা আর শুনতে চাই না। একলাফে উঠোনে নামি। উঠোনে ঘুরপাক খাই। বেলগাছ ছুঁয়ে চালতা গাছের নিচে দাঁড়াই। চালতার সাদা ফুল নাকের কাছে এলে বলি, চালতা সুন্দরী, এখন আমিও ফুল ফোটাতে পারব। তোমার মতো ধবধবে সাদা ফুল। নইলে আকাশের মতো নীল ফুল।

ঘর থেকে মা ডাকেন।

ঘরে আয় মার্সি। এসময় এত লাফালাফি করতে হয় না। ব্যথা হবে।

ব্যথা? মায়ের কথায় আমি ঘরে ফিরে আসি। বলি, আজ আমার আনন্দের দিন মা।

মা মৃদু হাসেন। বুঝতে পারি মা আমার আনন্দ দেখে মজা পাচ্ছেন। তিনি আমাকে যত্ন করেন। মাছের বড়ো টুকরো খেতে দেন। থালাভরা ভাত দিয়ে বলেন, সব খাবি।

ছোটোবোন জুসনা বলে, দিদিকে এত খেতে বলছ কেন মা? দিদির কি হয়েছে?

এই সংসারে এখন থেকে ও একটা নতুন মেয়ে। ওর যত্ন দরকার।

ছোটো ভাইটি চেঁচিয়ে বলে, কিন্তু, কেন এতকিছু, তা আমাদের জানতে হবে।

জানবি, জানবি।

মা ব্যস্ত হয়ে উঠে যান।

ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করে, তোর কী হয়েছে দিদি?

মা বলেছেন, আমি বড়ো হয়েছি।

তুই তো যতটুকু ছিলি ততটুকুই আছিস। একটুও লম্বা হোসনি।

আমি লাজুক হেসে বলি, আমি বেশি কিছু জানি না। মা বোধহয় পরে তোদেরকে বলবে।

ছোটো ভাইটি ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে বলে, ঘোড়ার ডিম! কচুর শাক।

হি-হি করে হাসে জুসনা। ওকে হাসতে দেখে ওর মাথায় চাপড় মারে বিলটন। বলে, বেশি হাসলে তোকে আমি ...

ভ্যাঁ করে কাঁদে জুসনা। আমাদের কারোই আর ঠিকমতো ভাত খাওয়া হয় না। ভাতের থালা ঠেলে রেখে আমরা যে যার মতো উঠে পড়ি। মা এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। কাউকে কিছু বলেন না। চুপচাপ থালাবাসন গোছাতে থাকেন। আমি খুশি যে আমি ঋতুমতী হওয়ার পর থেকে মা আমার যত্ন নেন।

মাস গড়ায়। বছর গড়ায়। ঋতুচক্রের আবর্তে আমি বুঝতে পারি কীভাবে মা হতে হয়। আমার শরীর যেন ঝমঝম করে ওঠে। বুঝেতে পারি না যে কোথায় পালাই, কোথায় যাই। বুঝতে পারি ফুলের ওপর মৌমাছির ওড়াউড়ি, বুঝতে পারি পাখির বাসার খবর। ডিম এবং ছানার খবর। আমার সামনে এখন নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে যায়। ছেলেগুলো পিছে লাগলে আমি ঘুরে দাঁড়াতে পারি। গরম চোখে শাসন করি। বলি, তোরা বাড়াবাড়ি করবি না। জুতো মারব।

ওরা প্রথমে অবাক হয়। তারপর জিজ্ঞেস করে, তোর কী হয়েছে রে মাছি?

আমার নাম ঠিক করে বল।

ও বাব্বা, সাহস বেড়েছে দেখছি। বাপ তো দিন দিন ফকির হয়ে যাচ্ছে। গাঁ-ছাড়া করে ছাড়বো।

সাহস থাকলে করিস দেখে নেব।

ওদের সামনে দিয়ে আমি হনহনিয়ে হেঁটে আসি। পেছনে শুনতে পাই ওদের কথা– কি হয়েছে ওর? এত চোটপাট বেড়েছে কেন? গাঁ ছাড়তে হলে বুঝবে?

আমি বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াই। আমি জানি আমাদের বাড়িতে অভাব নেমেছে। মামলায় বাবা জিতেছেন ঠিকই, কিন্তু হারিয়েছেন জমি। মামলার খরচ চালিয়েছেন জমি বিক্রি করে। এখন মাত্র এক কানি জমি আছে। মা কষ্টে সংসার চালায়। মাঝে মাঝে বলেন, তোরা আয় করতে শুরু করলে আমাদের কষ্টের দিন শেষ হবে রে মেয়ে।

আমি বলি, ধৈর্য ধরো মা। আমাদের দিন ফিরবে।

আমার মনে হয় মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বয়স আমার হয়ে গেছে। আমি তাদের বড়ো সন্তান। আমার এখন অনেক দায়িত্ব। আমি দ্বিতীয়বারের মতো আবার সাহসী হয়ে উঠি। আমার মনে হয় আমার জীবনের এক একটি ধাপে আমি অন্য ভাবনা নিয়ে বড়ো হচ্ছি। পড়ালেখার পাশাপাশি আমার এসব কিছুও শেখা হচ্ছে।

এরমধ্যে একদিন জুসান ঋতুমতী হয়। রক্ত দেখে ও ভয়ে-আতঙ্কে কান্নাকাটি শুরু করে। মা আমাকে বলেন, তুই ওকে সামলা। কী যে পাগলামি করছে।

মা ক্লান্ত। মা অনেকখানি নুয়ে পড়েছে। সংসারের অভাবই মাকে দুর্বল করে ফেলেছে। আমি জুসনাকে ঘরে নিয়ে সব বুঝিয়ে বলি। ওর কান্না থামে না। ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলি, তোর মা হওয়ার ক্ষমতা হয়েছে। ও আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে বলে, মা? আমি হেসে

ওর মাথায় চুমু দিয়ে বলি, হ্যাঁ। ঋতুমতী হওয়ার পরেই মেয়েরা মা হওয়ার শক্তি পায়। ও চোখ বড়ো করে বলে, ওই যে বললে প্রতি মাসে হবে? হ্যাঁ, তাতো হবেই। ও মাথা ঝাঁকিয়ে প্রবলবেগে বলে, না না আমি এত ঝামেলা সহ্য করতে পারব না। ও চিৎকার করে বলে, আমি মা হতে চাই না।

আমি ওর গালে চড় মারি। বুঝতে পারি বেশ জোরেই মেরেছি। আকস্মিকভাবে ওর কান্না থেমে যায়। দু'চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, মারলে কেন? আমি মা হবো কি-না হবো সেটা আমার খুশি। তোমার কী?

এই কথা আর দ্বিতীয়বার বলবি না।

কেন বলব না? কেন বলব না?

ও দুহাতে আমাকে ধরে ঝাঁকায়। আমি ওকে শান্ত করে বলি, আমাদের অনেক বড়ো কাজ করতে হবে জুসান।

কাজ? ওর চোখে বিস্ময়ের সীমা নেই।

রাখাইনদের মানুষ বাড়াতে হবে। তাহলে বাঙালিরা আমাদের ওপর জুলুম করতে পারবে না।

ধুত, কী যে বলিস এসব আমি বুঝতে পারি না। আমি এত ঝামেলা সইতে পারব না।

ও আমার সামনে থেকে ছুটে চলে যায়। উঠোনে চক্কর খায়। ঠিক আমি যেভাবে চক্কর দিয়েছিলাম সেভাবে। ওকে দেখতে আমার ভালো লাগছে। মনে হয় এমন সুন্দর দৃশ্য আমি অনেকদিন দেখিনি। আমার সামনে ও উড়ে আসা পরি হয়। আলো ছড়িয়ে দিয়েছে বাড়িতে।

মা আমাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলেন, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? কাজ হয়েছে?

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলি, হয়নি। হবে। তুমি কিছু ভেবো না।

মা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকান। প্রশ্ন করেন না। আমি বুঝি যে মা আমাকে নতুন করে দেখছেন। ভাবছেন, মেয়েটাকে চেনা লাগছে না। ও বোধহয় নতুন সাহস খুঁজে পেয়েছে। মায়ের ভাবসাব দেখে আমি খুব আনন্দ পাই।

একদিন বাড়িতে এসে বাবা ভেঙে পড়েন। বলেন, নিজেরা এক হতে হবে। নইলে এলাকার রাখাইন সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখা মুশকিল হবে।

আমি মাথা তুলে বলি, বাবা এটাতো নতুন সমস্যা না। আদিবাসী রাখাইনদের তাড়িয়ে দিয়ে ওরা জমি দখল করতে চায়। বাবা নিজেদের জমি নিজেদের রক্ষা করতে হবে।

এজন্য সামনে লড়াই আছে। মানুষ চাই। অনেক মানুষ।

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

আমি বাবাকে বলতে পারি না যে, জুসান ঋতুমতী হয়েছে। ও মানুষ আনবে। তুমি ভয় পেয়োনা বাবা। সাহস রাখো। দিদিমার মতো সাহস।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, কিছু বলবি?

তোমার কি তেষ্টা পেয়েছে বাবা?

হ্যাঁ রে, খুব তেষ্টা পেয়েছে।

দেখতে পাই মা বাবার জন্য ডাবের জল নিয়ে আসছে। বাবা এক চুমুকে সেই জল শেষ করে। আমার মনে হয় বাবাকে সমুদ্র দিলে সেটাও শেষ করে ফেলবেন। পড়ে থাকবে তলানি। কেউ কেউ বুঝি এমন তৃষ্ণা নিয়ে দিন কাটায়।

এসএসসি পাশ করার পরে আমার কুয়াকাটা সাগরসৈকতে যাওয়ার সুযোগ হয়। আমি ততোদিনে রাখাইনদের কাপড় বোনা শিখেছি। স্কুল বন্ধ থাকলে তাঁতে বাসি। টুকটাক আয় হয়। মাকে সেই টাকা দেই। মা খুব খুশি যে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে কাপড়ে নকশা তুলি। নিজেদের কাপড়ের নকশা আমি হারিয়ে যেতে দেবো না। প্রতিবেশীরা আমার নকশা করা কাপড় কিনতে পছন্দ করে। আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে বেশ। দুষ্ট ছেলেগুলো আমার পিছে আর লাগে না। মা আমাকে বলেন, তুই তোর দিদিমার যোগ্য নাতনি হয়েছিস।

কুয়াকাটা সাগরসৈকতে দাঁড়িয়ে আমার বুঝি পৃথিবী দেখা হয়। আমি পাগলের মতো জলে ঝাঁপাই। ঝিনুক কুড়াই। লাল কাঁকড়ার পেছনে ছুটে যাই। দেখা হয় মাছ ধরে ফিরে আসা জেলে জর্জির সঙ্গে। ওকে জিজ্ঞেস করি, কী মাছ ধরলেন?

ও হেসে বলে, অনেক মাছ ধরেছি। বড়ো একটা কোল-ভোল পেয়েছি।

আমি হাসতে হাসতে বলি, আমার খুব ইচ্ছে করে যে সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরি।

সত্যি? এমন ইচ্ছে হয়?

হ্যাঁ, হয়। সত্যি বলছি, হয়।

জর্জি অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলে, যাবে আমার সঙ্গে?

যাব। আমি খুব আবেগ দিয়ে উত্তর দেই। যেন ও হাত ধরলে আমি হেঁটে যেতে পারব সমুদ্রের উপর দিয়ে। সমুদ্রের পানি আমার জন্য সমতল ভূমি হয়ে যাবে! জিজ্ঞেস করি, কালকে আমাকে নেবেন?

না, কালকে না।

তাহলে কবে? আমার কণ্ঠস্বর দমে যায়।

জর্জি চোখ উজ্জ্বল করে বলে, যেদিন ভরা পূর্ণিমা থাকবে। পুরো চাঁদের ছায়ায় সমুদ্র ঢেকে থাকবে! আর জালের ভেতর ঢুকে যাবে হাজার হাজার মাছ।

আমি হেসে মাথা নাড়ি। পেছনে দাঁড়িয়ে চন্দনা আর মিয়াংচি বলে, কী রে প্রেম হয়ে গেল?

আমি রঙিন নুড়ি তুলে সাগরের বুকে ছুঁড়ে মারি। ওদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নেই।

একদিন ভরা পূর্ণিমার রাতে আমাদের বাসর হয়।

বিয়েটা ঠিক তারিখে হবে কি-না এটা নিয়ে আমাদের দুজনের মনে আশঙ্কা ছিল। কারণ মাত্র দুদিন আগে জমির বিরোধ নিয়ে বাঙালি-রাখাইনের মধ্যে মারামারি হয়। তবে বড়ো ধরণের হাতহত হয়নি। অন্যরা এসে বিরোধ থামিয়ে দেয়।

আমার মা বিয়ের তারিখ ঠিক রাখার ব্যাপারে একরোখা ছিলেন বলে আগের তারিখেই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। আমরা দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। ঘটনা আবার কোনদিকে মোড় নেয় এই ভয়ে আমাদের খুব ভয় ছিল।

রাত বাড়ে। চারদিক নীরব হয়ে গেছে।

বিছানায় জর্জি আমাকে বলে, আজ ভরা পূর্ণিমা। আমাদের জীবনে এই রাত চাঁদে-ফুলে-সাগরে-মাছে-পাখি-ফসলে ভরে উঠুক।

আমি হাসতে হাসতে বলি, বাব্বা, তুমি এত কিছু চাইছ!

তুমি চাইবে না?

হ্যাঁ, নিশ্চয় চাইব। আমি সন্তান চাই।

বেশতো, আমিও সন্তান চাই।

আমি পঁচিশটা সন্তান চাই।

আঁতকে ওঠে জর্জি।

পঁচিশটা!

আমি জর্জির বুকে হাত রেখে বলি, আমি রাখাইন সম্প্রদায়কে বড়ো করতে চাই। ঋতুমতী হওয়ার পর থেকে আমি নিজের মধ্যে এই প্রতিজ্ঞা ধরে রেখেছি।

জর্জি দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে টেনে নেয়। আমি আমার চারদিকে সাগরের কল্লোল শুনি।

মুজিববর্ষে পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর

ড. শিল্পী ভদ্র

২০২০ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম তারিখ থেকে ২০২১ সালের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত মুজিববর্ষ পালিত হবে। এখানে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী থাকবে। মুজিববর্ষে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সরকার। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভাগের আওতাধীন সব অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কার্যক্রম সমন্বয় করবে স্থানীয় সরকার বিভাগ। মুজিববর্ষের কার্যক্রম উপলক্ষে মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সংস্থার সমন্বয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এসব কর্মপরিকল্পনা স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেন, মুজিববর্ষকে সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। মন্ত্রী বলেন, ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে মুজিববর্ষ পালন করা হবে। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে আমরা পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরো জানিয়েছেন, মুজিববর্ষকে সামনে রেখে গ্রামে এডিস মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু যাতে ছড়িয়ে না যায় সেজন্য সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। কম-বেশি সব জায়গায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঘটায় কর্মপদ্ধতির কথা তুলে ধরে এলজিআরডি মন্ত্রী বলেন, দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রথমে ছোটো এলাকায় কাজ শুরু হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে চালুকৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে।

তাজুল ইসলাম আরো বলেন, ভিশন– ২০২১, ২০৪১, এসডিজি অর্জন ও উন্নয়নের মানদণ্ড হিসেবে পরিচ্ছন্ন জনপদ গড়ে তোলা, সর্বসাধারণের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দৈনন্দিন অভ্যাস গড়ে তোলা, জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করা, মশাবাহিত, পানিবাহিত, বায়ুবাহিত, মৌসুমি রোগবালাই হতে পরিত্রাণ পাওয়া, প্লাস্টিক, পলিথিনের ব্যবহার রোধ, পলিথিনের ব্যবহার সীমিতকরণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নতুন প্রজন্মকে উন্নত-পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা, তাদের মধ্যে জীবনব্যাপী পরিচ্ছন্নতার বোধ ও অভ্যস্ততা গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে 'পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রম সারা দেশব্যাপী শুরু হয়েছে। এ বিষয়ক তথ্য, সংবাদের মধ্যে রয়েছে– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৩০টি ওয়ার্ডে একযোগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

'পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন শহর, সবুজ, পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব ও বাসযোগ্য মহানগরী গড়তে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা করুন' শীর্ষক র‍্যালি ১লা জানুয়ারি, বিকেল চারটায় ৩০টি ওয়ার্ডে একযোগে, পৃথকভাবে বের করা হয়। একইভাবে অন্যান্য ওয়ার্ডে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সাধারণ নারী-পুরুষ অংশ নেন। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক লেখা সম্বলিত বিভিন্ন প্লেকার্ড। প্লেকার্ডের লেখাগুলো হচ্ছে– 'দয়া করে ড্রেনে পলিথিন, ময়লা-আবর্জনা, ইট, বালি, কাঠ, পানির বোতল ফেলবেন না', 'ব্যক্তিগত মাটি, রাবিশ, ইট, বালি রাস্তায় না রেখে নিজ দায়িত্বে অপসারণ করুন', 'ড্রেনের মধ্যে আবর্জনা ফেলবেন না', 'আপনার বাসাবাড়ির আবর্জনা যত্রতত্র না ফেলে সিটি কর্পোরেশনের ভ্যানে দিন', 'ঝোপঝাড়, জঙ্গল, কচুরিপানা, জলাবদ্ধ স্থান নিজ দায়িত্বে পরিষ্কার করুন', 'এই শহর আমার, এই দেশ আমার, পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বও আমার', নিজ আঙিনা পরিষ্কার রাখি, সবাই মিলে সুস্থ থাকি' ইত্যাদি।

গাজীপুরে মুজিববর্ষে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশক নিধন, গণ-সচেতনতা তৈরি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করা হয়েছে। এ উপলক্ষে জেলা পরিষদের উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভোলায় 'হাসপাতাল আমার বাড়ি, পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল গড়ি'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে ভোলা জেলা প্রশাসনের ক্রাশ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে সদর হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ বছরটিকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন নগরজুড়ে ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

চসিক অর্থায়নে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে নগরে আকর্ষণীয় স্থানে চারটি কাউন্টডাউন ক্লক– নগরের আন্দরকিল্লা পুরাতন চসিক ভবনের সামনে 'এ' ক্যাটাগরি একটি এবং সার্কিট হাউসের সামনে, আদালত ভবন এবং শাহ আমানত সেতু এলাকায় 'বি' ক্যাটাগরি তিনটি কাউন্টডাউন ক্লক বসানো হচ্ছে।

এদিকে বিশেষ পরিষ্কারকরণ, ডোর টু ডোর সেবকদের কাজের মানবৃদ্ধির জন্য কর্মশালা, চসিক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ, হাসপাতাল, অফিস ও শপিং কমপ্লেক্স ইত্যাদি পরিষ্কারকরণ, গৃহস্থালির বর্জ্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার বিষয়ে, 'পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করুন', 'চট্টগ্রাম শহরকে সুস্থ রাখুন'সহ বিভিন্ন স্লোগান সম্মিলিত সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চালু করা হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে ময়মনসিংহে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। মহানগরীকে বর্ণিল সজ্জায় সাজাতে চলছে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসন, আওয়ামী লীগ ও সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে চলছে নানা প্রস্তুতি।

ইতোমধ্যে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার জন্য আকর্ষণীয় ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে। মহানগরীকে বর্ণিল সাজে সাজাতে বিভিন্ন স্থানে আলোকসজ্জা করা হয়েছে। রাস্তা সংস্কার, রাস্তা থেকে ময়লা আর্বজনা অপসারণ, নগরীর মূল সড়কগুলোর দুপাশের দেয়ালে নতুন রং লাগানো ইত্যাদি করা হয়েছে। সরকারি ভবনের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বাণী। নগরীকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করতে বিভিন্ন স্থানে সাঁটানো ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার অপসারণ করা হয়েছে। নতুন করে এগুলো আর না লাগাতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নানা আয়োজন সবার জীবনে আনন্দ বয়ে নিয়ে আসবে– এটাই প্রত্যাশা সবার। সেই সঙ্গে পুরো জাতি সারা বছরজুড়ে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানকে।

লেখক: গবেষক ও লেখক

৪৪তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলায় বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন

কলকাতা পুস্তকমেলা থেকে ফিরে

সুফিয়া বেগম

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। মেলা তখনো বসেনি। বাংলাদেশি একজন দর্শক-ক্রেতার কথায় মনযোগী হলাম– পাশের বেঞ্চিতে বসা একজন কলকাতার দর্শককে উদ্দেশ করে জনৈক দর্শনার্থী বলছেন, আচ্ছা দাদা এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে একটা বিষয় আমার নজরে পড়েছে– ফুট ওভারব্রিজ, ফ্লাইওভার এবং কলকাতার মোড়ে মোড়ে সবখানেই মমতা ব্যানার্জীর ছবি, আমাদের ঢাকায় তো শেখ হাসিনার এত ছবি টাঙানো নেই। কলকাতার দাদা তখন জবাব দিল– দাদা মমতা ব্যানার্জী শুধু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আর আপনাদের শেখ হাসিনা সমগ্র বাংলাদেশের।

আস্তে আস্তে বৃষ্টি থেমে আসে। বাংলাদেশ প্যাভেলিয়নের দিকে এগুই। আমাদের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের স্টল নং ৪। স্টলে এরই মধ্যে প্রচুর দর্শক-ক্রেতা উপস্থিত হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ক্রেতার চেয়ে দর্শক আজ একটু বেশি। বই নেড়েচেড়ে দেখছেন। কেউ বই কিনছেন, কেউ আবার দাম জেনে যাচ্ছেন, পরে আবারো আসবেন বলে যাচ্ছেন।

কলকাতার সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৪৪তম কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা। ১২ দিনব্যাপী আয়োজিত এই মেলা শুরু হয় ২৯শে জানুয়ারি আর শেষ হয় ৯ই ফেব্রুয়ারি। ২৮শে জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় মেলা উদ্‌বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী । কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা ২০১৯-এর থিম কান্ট্রি ছিল রাশিয়া। প্রতিদিন মেলায় সময়সূচি ছিল দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। রবিবার ছুটির দিন এবং ৯ই ফেব্রুয়ারি শেষ দিন হওয়ায় ক্রেতাদের ভিড় বেশি ছিল। বইপ্রেমীদের অনুরোধে মেলা খোলা ছিল রাত ৯টা পর্যন্ত। ৯ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা পুস্তকমেলায় পালিত হয় 'বাংলাদেশ দিবস'। দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল– 'মুজিব শতবর্ষ পালন'। প্রতিবছরের মতো এবারো আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলায় অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের প্রকাশকরা। বাংলাদেশ ছাড়াও মেলায় অংশ নিয়েছে– রাশিয়া, চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পেন, স্কটল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনাসহ বিশ্বের ২১টি দেশ। ভারতের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা পুস্তকমেলায় অংশ নেয়। ৩ হাজার বর্গফুট জায়গাজুড়ে বাংলাদেশের প্যাভেলিয়নটি বেশ আকর্ষণীয় ছিল। ৮টি সরকারি স্টলসহ ৫৩টি বাংলাদেশি স্টল ছিল এই প্যাভেলিয়নে। ৮টি সরকারি স্টলের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ছিল একটি। এই অধিদপ্তর থেকে আমরা ৬ জন কলকাতা পুস্তকমেলায় অংশগ্রহণ করি। এই কলকাতা পুস্তকমেলায় অংশ নেন এই অধিদপ্তরের পরিচালক প্রশাসন স. ম. গোলাম কিবরিয়া, সুফিয়া বেগম, উপপরিচালক (সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ), সাব-এডিটর শাহানা আফরোজ, সাবিনা ইয়াসমিন, সম্পাদনা সহযোগী মেজবাউল হক ও ফিল্ড এক্সিবিশন অফিসার সালেহ আহমেদ।

বাংলাদেশ প্যাভেলিয়নটি ছিল খুবই সুসজ্জিত। প্যাভেলিয়নে ছিল উপচেপড়া ভিড়। লাইন ছিল বেশ লম্বা। বাংলাদেশপ্রিয় কলকাতার মানুষজনের বই কেনার পাশাপাশি ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা। অনেকেই বাংলাদেশের মানচিত্র কিনেছেন। বাংলাদেশে জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন এবং একসময় দেশ ছেড়ে চলে গেছেন– তাদের মধ্যে অনেকেই এসেছেন বাংলাদেশের প্যাভেলিয়নে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের স্টলে যারা এসেছিলেন সেই দর্শক-ক্রেতাদের অনেকেই ১৯৭১ সালের পরে বাংলাদেশ ছেড়ে গেছেন। কারো বাপ, দাদা ছেড়ে গেছেন ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর। জন্মস্থানের স্মৃতি অনেককেই নস্টালজিক করে তোলে। শৈশবের স্মৃতিকাতরতা তাদের কথায় প্রকাশ পাচ্ছিল। আমাদের প্রকাশনাগুলোর প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল কলকাতার বইপ্রেমীদের। বাংলাদেশের পাখি, বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী, বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্রের সিডি'র প্রতি কলকাতার দর্শকদের আকর্ষণ ছিল বেশি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি, নবারুণ, সচিত্র বাংলাদেশের চাহিদাও ছিল প্রচুর। ৯ই ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশ দিবস' উপলক্ষে মেলা চত্বরের অডিটরিয়ামে আয়োজন

করা হয়েছিল সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পীরা অংশ নেন। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য– 'মুজিববর্ষ পালন'।

সময়ের অভাবে কলকাতা ঘুরে দেখার তেমন সুযোগ হয়নি। ৬ দিনের জন্য গিয়েছিলাম পুস্তকমেলায়। তারপরও প্রতিদিন সকালে কিছু কিছু জায়গা ঘুরে দেখেছি, যেমন– শপিং করেছি, পাশাপাশি ভিক্টোরিয়া পার্ক, হাওড়া ব্রিজ, ব্রিজের নীচের গঙ্গা, জাতীয় জাদুঘর ইত্যাদি। কলকাতা শহর ১২০ বছর ধরে হাতেটানা রিকশার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। ৩০০ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী কলকাতা ঢাকার মতোই মাঝারি মানের শহর।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই মেলার স্থানটি দখল করে আছে আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা। কারণ এখানে সবচেয়ে বেশি পাঠক সমাবেশ ঘটে। একে এশিয়ার প্রধান পুস্তকমেলাও বলা হয়। বাংলা ভাষাভাষীর পাঠকদের জন্য কলকাতা পুস্তকমেলার গুরুত্ব অনেক। কলকাতা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজনে ১৯৯২-এর আগ পর্যন্ত এ দুটি মেলা একত্রে হতো। কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা নামেই এই মেলা বিশ্বে পরিচিত। প্রতিবছর কোনো একটি দেশকে 'থিম কান্ট্রি'র মর্যাদা দিয়ে কলকাতা পুস্তকমেলা সমাপ্ত হয়। ২০১৬ সালে ছিল বলিভিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ৫০ বছর পূর্তি। 'চে গুয়েভারা'কে স্মরণ করে পুস্তকমেলায় মূল থিমের দেশ ছিল বলিভিয়া। কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলায় ২০১৭ সালের 'থিম কান্ট্রি' ছিল কোস্টারিকা। ২০১৯ সালের থিম কান্ট্রি রাশিয়া।

২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করে বাংলাদেশকে 'থিম কান্ট্রি' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা কর্তৃপক্ষ ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে ৪৪তম আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা ২০২০-এর সমাপনী ও বাংলাদেশ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা প্রদান করে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও সংসদীয় বিষয়ক

বাংলাদেশ প্যাভেলিয়নে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের স্টলে পরিচালক স.ম. গোলাম কিবরিয়া, সালেহ আহমেদ (ফিল্ড এক্সিবিশন অফিসার) ও মেজবাউল হক (কপি হোল্ডার)

রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়সহ উভয় দেশের রাজনৈতিক ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতা পুস্তকমেলায় বাংলাদেশ প্যাভেলিয়নের সবাইকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন। মেলার শেষ দিনে উপ-হাইকমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় নৈশভোজের। বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং ৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন। পরে 'বাংলাদেশ দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশে উপ-হাইকমিশন কলকাতার আয়োজনে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান খান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ শ্রী গৌতম ভদ্র ও বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র-এর পরিচালক মিনার মনসুর।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের স্টলে ক্রেতা-দর্শকদের সমাবেশ

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু

জসীমউদ্‌দীন

মুজিবর রহমান
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে
জ্বালায় জ্বলিছে মহা কালানল ঝঞ্ঝা-অশনি বেয়ে
বিগত দিনের যত অন্যায় অবিচার ভরা-মার,
হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার;
দিনে দিনে হয়ে বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে,
দগ্ধিত হয়ে শত লেলিহান ছিল প্রকাশের মুখে;
তাহাই যেন বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি
ওই নামে আজ অশনি দাপটে ফিরিছে ধরণীর ভরি।
মুজিবর রহমান!
তব অশ্বেরে মোদের রক্তে করায়েছি পুত-স্নান।
পীড়িত-জনের নিশ্বাস তারে দিয়েছে চলার গতি,
বুলেটে নিহত শহীদেরা তার অঙ্গে দিয়েছে জ্যোতি।
দুর্ভিক্ষের দানব তাহারে দেছে অদম্য বল,
জঠরে জঠরে অনাহার-জ্বালা করে তারে চঞ্চল।
শত ক্ষতে লেখা অমর কাব্য হাসপাতালের ঘরে,
মুহুর্মুহু যে ধ্বনিত হইছে তোমার পথের পরে।
মায়ের বুকের ভায়ের বুকের বোনের বুকের জ্বালা,
তব সম্মুখ পথে পথে আজ দেখায়ে চলিছে আলা।
জীবন দানের প্রতিজ্ঞালয়ে লক্ষ সেনানি পাছে,
তোমার হুকুম তামিলের লাগি সাথে তব চলিয়াছে।
রাজভয় আর কারাশৃঙ্খল হেলায় করেছে জয়,
ফাঁসির মঞ্চে– মহত্ত্ব তব তখনো হয়নি ক্ষয়।
বাংলাদেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রমূর্ত রাজ,
প্রতি বাঙালির হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার তক্ত তাজ।
তোমার একটি আঙুলি হেলনে অচল যে সরকার
অফিসে অফিসে তালা লেগে গেছে– স্তব্ধ হুকুমদার।
এই বাঙলায় শুনেছি আমরা সকল করিয়া ত্যাগ,
সন্ন্যাসী বেশে দেশ-বন্ধুর শান্ত-মধুর ডাক।
শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী– জীবন করিয়া দান,
মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান
তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে আর,
জাতিতে জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাঙলার।
তোমার হুকুমে রেল-জাহাজের চাকা যে চলেনি আর,
হাইকোর্টের বন্ধ দরজা খুলিবে সাধ্য কার!
সেনাবাহিনীর অশ্বে চড়িয়া দম্ভ-স্ফীত ত্রাস,
কামান গোলার বুলেটের জোরে হানে বিষাক্ত শ্বাস।
তোমার হুকুম তুচ্ছ করিয়া শাসন-ত্রাসন ভয়,
আমরা বাঙালি মৃত্যুর পথে চলেছি আনিতে জয়।
ধন্য এ কবি ধন্য এ যুগে রয়েছে জীবন লয়ে,
সম্মুখে তার মহাগৌরবে ইতিহাস চলে বয়ে।
ভুলিব না সেই মহিমার দিন, ভাষার আন্দোলনে;
বুলেটের ভয় তুচ্ছ করিয়া ছেলেরা দাঁড়াল রণে।
বরকত আর জব্বার আর সালাম পথের মাঝে,
পড়ে বলে গেল, 'আমরা চলিনু ভাইরা আসিও পাছে।'
উত্তর তার দিয়েছে বাঙালি, জানুয়ারি সত্তরে,
ঘরের বাহির হইল ছেলেরা বুলেটের মহাঝড়ে।
পথে পথে তারা লিখিল লেখন বুকের রক্ত দিয়ে,
লক্ষ লক্ষ ছুটিল বাঙালি সেই বাণী ফুকারিয়ে।
মরিবার সে কি উন্মাদনা যে, ভয় পালাইল ভয়ে,
পাগলের মতো ছোটে নর-নারী মৃত্যুরে হাতে লয়ে।
আরো একদিন ধন্য হইনু সে মহাদৃশ্য হেরি,
দিকে দিগন্তে বাজিল যেদিন বাঙালির জয়ভেরী।
মহাহুঙ্কারে কংস-কারার ভাঙিয়া পাষাণ দ্বার,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরে করিয়া আনিল বার।
আরো একদিন ধন্য হইব, ধন-ধান্যতে ভরা,
জ্ঞানে-গরিমায় হাসিবে এদেশ সীমিত বসুন্ধরা।
মাঠের পাত্রে ফসলেরা আসি ঋতুর বসনে শোভি,
বরণে সুবাসে আঁকিয়া যাইবে নকশি কাঁথার ছবি।
মানুষে মানুষে রহিবে না ভেদ, সকলে সকলকার,
একসাথে ভাগ করিয়া খাইবে সম্পদ যত মার।
পদ্মা মেঘনা যমুনা নদীর রুপালির তার পরে,
পরান ভুলানো ভাটিয়ালি সুর বাজিবে বিশ্বভরে!
আম-কাঁঠালের ছায়ায় শীতল কুটিরগুলির তলে,
সুখ যে আসিয়া গড়াগড়ি করি খেলাইবে কৌতূহলে।
আরো একদিন ধন্য হইব চির-নির্ভীকভাবে,
আমদের জাতি নেতার পাগড়ি ধরিয়া জবাব চাবে,
কোন অধিকারে জাতির স্বার্থ করিয়াছ বিক্রয়?
আমার এদেশ হয় যেন সদা সেই রূপ নির্ভয়।

ঢাকা: ১৬ই মার্চ ১৯৭১

মনীষীর কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু: উদ্যোক্তা ভাবনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্সের ফ্যাকাল্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী। তিনি বিএসএস, এমএসএস (অর্থনীতি), এমকম ও এমসিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ফিন্যান্সিয়াল ইকোনমিক্সে এম ফিল এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে পিএইচডি করেন। তিনি Entrepreneurship বিষয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর সাবেক উপাচার্য। বর্তমানে তিনি ওয়ার্ল্ড বিজনেস ইনস্টিটিউ অস্ট্রেলিয়ার ফেলো, বাংলাদেশ একাডেমি ফর বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর সহসভাপতির পদসহ দেশ ও বিদেশে অর্থনীতি ও ব্যবসা বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোক্তা উন্নয়ন ভাবনা ও কর্ম সম্পর্কে ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্সের Entrepreneurship প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. মুহম্মদ মাহবুব আলীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন বিশিষ্ট অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক, গবেষক ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের (বিডিবিএল) অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক এম এ খালেক।

প্রশ্ন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর ভাবনায় উদ্যোক্তা উন্নয়নের বিষয়টি কীভাবে এসেছিল?

প্রফেসর ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন একটি দেশের সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধু নিজেও ছাত্রজীবনে একবার ব্যাবসা করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি সফল হয়েছিলেন রাজনৈতিক উদ্যোক্তা হিসেবে। এ বিষয়ে এবারের একুশের বইমেলায় আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, যার শিরোনাম *রাজনীতির উদ্যোক্তা বঙ্গবন্ধু*। রাজনৈতিক উদ্যোক্তা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সফলতার পেছনে যেসব কারণ কাজ করেছিল তারমধ্যে প্রধান হচ্ছে তিনি জনগণের কথা ভাবতেন, তিনি জনগণকে ভালোবাসতেন। বঙ্গবন্ধু সর্বোত্তম জনকল্যাণের কথা ভাবতেন। তিনি শোষিত-বঞ্চিত মানুষের কথা ভাবতেন। এই ভাবনা বঙ্গবন্ধুকে সবসময় আলোড়িত করত। তিনি গ্রামগঞ্জের তরুণ সমাজের উন্নয়নের কথা ভাবতেন, তাদের সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতেন। বঙ্গবন্ধু গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। আমরা সবাই জানি, বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেছিলেন, যাতে তুলনামূলক কম সম্পদশালী কৃষকের ওপর আর্থিক চাপ হ্রাস পায়। একইসঙ্গে তিনি ১০০ বিঘা জমির সিলিং নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, যাতে জমির মালিকানা সামান্য কিছু সম্পদশালী মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়। বর্তমানে আমরা উন্নত দেশগুলোতে যে কল্যাণমুখী অর্থনীতির কথা শুনি, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনাও ছিল অনেকটা সেই রকম। স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সব উৎপাদনযন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন। সব কলকারখানা রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল। উৎপাদনযন্ত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত যে সাময়িক ছিল তা পরবর্তী কার্যক্রম থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে যে সংশোধিত শিল্পনীতি প্রণীত হয় সেখানে ব্যক্তি খাতের বিকাশ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আহরণে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোক্তা উন্নয়ন ভাবনার কিছুটা বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। বঙ্গবন্ধু সব সময়ই চাইতেন দেশের মানুষ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের সৃজনশীল মেধা বিকাশের সুযোগ পাক। বঙ্গবন্ধু গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর সব সময়ই গুরুত্ব দিতেন। তাঁর লক্ষ্যই ছিল শহরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গ্রাম যেন কোনোভাবেই পিছিয়ে না পড়ে। শুনলে অবাক হবেন, বঙ্গবন্ধুই সেই ব্যক্তি যিনি শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ এবং আমানতের ওপর প্রদত্ত সুদের হারের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আনয়ন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষের আমানতের ওপর বেশি হারে সুদ প্রদান করা হতো। আবার শহরাঞ্চলের মানুষের চেয়ে তুলনামূলক কম সুদে গ্রামের মানুষ ঋণ পেত। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর এই যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা আজ তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা তা অনুসরণ করছেন। ১৯৭২ সালে যে অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তার মূল কথাই ছিল সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধু পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাই তিনি চাননি স্বাধীন বাংলাদেশেও বিত্তবান এবং বিত্তহীনের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হোক এবং দেশের সম্পদ সামান্য কিছু মানুষের কুক্ষিগত হোক। বর্তমানে গ্রামীণ অর্থনীতি অত্যন্ত চাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রামের যে আমানত সংগৃহীত হচ্ছে তার মাত্র ৬ শতাংশের মতো পল্লি এলাকায় বিনিয়োগ হচ্ছে। বর্তমান সরকার এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শহরের সুবিধা গ্রামে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছেন। এটা করা গেলে গ্রাম থেকে উদ্বৃত্ত পুঁজি শহরমুখী হওয়া থেকে অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন: পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা আপনি কীভাবে দেখেন?

প্রফেসর ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী: পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া শিল্পকারখানা অধিকাংশই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এগুলোকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা না হলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারত। সেই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যই বঙ্গবন্ধু জাতীয়করণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই জাতীয়করণ নীতি ছিল সম্পূর্ণরূপেই একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। আমি বঙ্গবন্ধুর জাতীয়করণ নীতিকে জাপানি নীতির সঙ্গে তুলনা করতে চাই। জাপানও প্রথমে শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করে। পরে কিছু বড়ো বিজনেস হাউজ তৈরি করে। এই বিজনেস হাউজগুলো এখন সারা বিশ্বব্যাপী সুনামের সঙ্গে ব্যাবসাবাণিজ্য করছে। বঙ্গবন্ধু ঠিক এমনি একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আমরা তার প্রমাণ পাই পরবর্তী শিল্পনীতিগুলো পর্যালোচনা করলে। আগেই বলা হয়েছে, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে যে সংশোধিত শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছিল সেখানে ব্যক্তি খাতের বিকাশ এবং বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ আহরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছিলেন। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে গ্রামীণ এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাধিকবার ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠনের কথা বলেছেন। ক্ষুদ্র সঞ্চয় সৃষ্টি করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কারো নিকট সঞ্চিত অর্থ থাকলেই তা বিনিয়োগে আসতে পারে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠন করার পর ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে বিনিয়োগে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সেই নির্দেশিত পথ ধরেই বর্তমান সরকার গ্রাম ও শহরের মানুষের ক্ষুদ্র পুঁজিকে বিনিয়োগে রূপান্তর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি দীর্ঘ দিন গবেষণা করে দেখেছি, শুধু পুঁজি গঠন করলেই একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয় না, যদি সেই পুঁজিকে বিনিয়োগে নিয়ে আসা না যায়। এজন্য বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণে গ্রামের আমানতকারীদের জন্য তুলনামূলক বেশি সুদ প্রদানের মাধমে পুঁজি গঠনকে সহায়তা করা যেতে পারে এবং একইসঙ্গে সেই পুঁজিকে বিনিয়োগে নিয়ে আসার লক্ষ্যে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের জন্য তুলনামূলক কম সুদে ব্যাংক ঋণ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য 'উন্নয়নের রোল মডেল'-এ পরিণত হয়েছে তা বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ অনুসরণের কারণেই সম্ভব হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করতেন বলেই যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে তাঁর দেখানো পথ ধরেই উন্নয়নের গন্তব্যে এগিয়ে চলেছে।

প্রফেসর ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী

প্রশ্ন: আপনি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর দেখনো পথ ধরে বর্তমান সরকার উদ্যোক্তা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। একজন উদ্যোক্তা উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ হিসেবে উদ্যোক্তা উন্নয়নে বর্তমান সরকারের কয়েকটি পদক্ষেপের কথা বলবেন?

প্রফেসর ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী: বর্তমান সরকার উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি খাতে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একজন উদ্যোক্তা উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরে বাংলাদেশে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রথম যিনি কাজ করেছেন তিনি হলেন প্রয়াত লুৎফর রহমান সরকার। বিকল্পের মাধ্যমে তিনি ৪৭০ জন উদ্যোক্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সরকার নতুন ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা দানের জন্য জাতীয় বাজেটে প্রথমবারের মতো 'স্টার্ট আপ বিজনেস' নামে একটি বিশেষ খাত তৈরি করেছে, যেখানে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) সারা দেশব্যাপী সম্ভাবনাময় ২০ হাজার উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করছে। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে দেশজুড়ে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক লাখ নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করবে। এছাড়া বর্তমান সরকার ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে কৃষি ও পল্লিঋণ নামে বিশেষ এক ধরনের ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এই ঋণদান কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লি এলাকায় কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি করে তাদের অর্থায়নের ব্যবস্থা করা। প্রথম বছরে এই ঋণদান কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ ছিল ৯ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে এসে এই ঋণদান কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ১৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ হাজার ১২৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। কৃষি ও পল্লিঋণের সুদের হার হচ্ছে ৯ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবারই বলেছেন, আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা চাকরি খুঁজবে কেন, তারা চাকরি দেবে। তিনি শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠার জন্য পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদের নেতৃত্বে ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্সের উদ্যোগে উদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। আমরা উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য তিনটি বিশেষ কোর্স চালু করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের তরুণ-তরুণীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। তারা যাতে উদ্যোক্তা হিসেবে যে-কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে সেভাবেই তাদের গড়ে তোলা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরে যদি দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে উদ্যোক্তায় পরিণত করতে পারি তাহলে আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল ভোগ করতে পারব।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ, যা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে–এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা কতটা মনে করেন? বর্তমান সরকার উদ্যোক্তা উন্নয়নে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?

প্রফেসর ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী: গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ অবতারণার জন্য ধন্যবাদ। বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাংকের রেটিংয়ে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ বাংলাদেশকে প্রাথমিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান দিয়েছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠে আসবে। এই অবস্থায় আমাদের টেকসই উন্নয়নের ধারা

অব্যাহত রাখতে হবে। এটা করতে হলে উদ্যোক্তা উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশে উদ্যোক্তা উন্নয়নের বিষয়টি আগে গুরুত্ব পায়নি। বর্তমান সরকার উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ৪ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। যেখানে কানাডার মতো দেশের মোট জনসংখ্যাই হচ্ছে তিন কোটি ৬৪ লাখ। অর্থাৎ কানাডার মোট জনসংখ্যার চেয়ে আমাদের দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি। প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণীকে উদ্যোক্তায় পরিণত করা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। উদ্যোক্তা উন্নয়ন করতে হলে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এই দিকটি বিবেচনায় রেখে ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স-এর উদ্যোগে উদ্যোক্তা অর্থনীতি চালু করা হয়েছে। চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি এবার থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। আমরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, দেশের সত্যিকার এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। একজন উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সরকার নানাভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের (এসএমই) সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছে। কুটিরশিল্প এবং মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিকে এসএমই খাতের অন্তর্ভুক্ত করে এই খাতের নতুন নামকরণ করা হয়েছে কটেজ, মাইক্রো,স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (সিএমএসএমই)। ফলে এখন থেকে এসএমই সেক্টরের জন্য শিল্পনীতিতে যে সব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার কথা রয়েছে তা কুটির এবং মাইক্রো শিল্পের উদ্যোক্তারাও ভোগ করতে পারবেন। এতে পল্লি এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় এসএমই সেক্টরের জন্য জামানতবিহীন ঋণ দানের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। যারা এত দিন জামানত প্রদানের অক্ষমতার কারণে ব্যাংক ঋণ পেতেন না তারাও এখন ব্যাংক ঋণ পাবেন। বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী একটি বড়ো কোম্পানির মাধ্যমে আইটি সেক্টরে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই উদ্যোগটি অত্যন্ত ভালো। আমি মনে করি, বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য ভেনচার ক্যাপিটাল, স্টার্ট আপ, সিড মানি এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে। ভেনচার ক্যাপিটাল এখনো আমাদের দেশে তেমন একটা পরিচিতি লাভ করেনি। এসব কর্মসূচি ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হলে জবাবদিহি থাকবে। স্কিল এনহ্যান্সমেন্টের জন্য ৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে যুগ পালটে গেছে। এখন দক্ষ উদ্যোক্তা হতে হলে তাকে আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আজকের যুগে আমাদের মতো দেশের জন্য টেকনো এন্টারপ্রেনর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স টেকনো এন্টারপ্রেনর সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আরো গড়ে তোলা যেতে পারে।

প্রশ্ন: সবাই উদ্যোক্তা হতে পারেন না। সত্যিকার উদ্যোক্তা হতে হলে একজন মানুষের মধ্যে কী কী গুণাবলি থাকা দরকার?

প্রফেসর ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী: উদ্যোক্তা হতে হলে প্রথমেই তার লক্ষ্য স্থির করতে হবে। ব্যাবসাবাণিজ্যের কৌশলগুলো বুঝতে এবং জানতে হবে। তাকে অবশ্যই ফান্ডের উৎস সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ফান্ড কোথা থেকে এবং কীভাবে আসবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। একজন উদ্যোক্তাকে সব সময়ই ঝুঁকি বহন করার মতো মানসিকতা ধারণ করতে হবে। কারণ উদ্যোক্তার জন্য ঝুঁকি একটি সাধারণ ব্যাপার। তাই তাকে সব সময়ই ঝুঁকি গ্রহণের মতো মনোভাবের অধিকারী হতে হবে। একজন উদ্যোক্তাকে শুধু ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের কথা ভাবলেই চলবে না তাকে জনকল্যাণের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। উদ্যোক্তার অবশ্যই মুনাফা অর্জনের দিকে দৃষ্টি থাকবে কিন্তু সেটা জনকল্যাণকে উপেক্ষা করে নয়। একজন সফল উদ্যোক্তা তিনিই হতে পারেন যিনি পুরনোকে আঁকড়ে না ধরে সব সময়ই নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারবেন। উদ্যোক্তা হতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধৈর্য। কারণ উদ্যোক্তা হলে এক সময় মুনাফা অর্জিত হতে পারে আবার লোকসানও হতে পারে। এতে ভেঙে পড়লে চলবে না। বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত পথে উদ্যোক্তা উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি সফল হোক এবং উদ্যোক্তা তৈরি হওয়া অব্যাহত থাকুক–এই প্রার্থনা করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক, গবেষক ও বিডিবিএল–এর অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক এম এ খালেক

মুজিববর্ষে তিন লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে মুজিববর্ষকে সামনে রেখে দেশের দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় পরিবার পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ সক্ষমতা বাড়াতে তিন লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ লক্ষ্যে কাজ করছে।

২০১৮ সালের ৬ই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঝালকাঠি জেলা সদর, কাঁঠালিয়া ও নলছিটি উপজেলায় পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। এছাড়া পাঁচ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আরো ২০০ সাইলো নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। খাদ্য অধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, মাঠপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি স্থাপনার ডিজিটাল ট্রাক ওয়েটব্রিজ স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় ৬টি বিভাগীয় শহর বরিশাল, খুলনা, সিলেট, রংপুর ও রাজশাহীতে একটি করে ছয়টি ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজশাহী ছাড়া ৫টি বিভাগীয় শহরে এরই মধ্যে এর কাজ শুরু হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত সাইলোগুলোর কার্যকরী ধারণক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে মেরামত ও সংস্কারমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে খাদ্য মজুদ ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ শুরু হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে খাদ্যের মজুদ, সংরক্ষণ ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের সাইলো, বিভিন্ন পর্যায়ের দপ্তরসহ এক হাজার ৬৪০টি স্থাপনায় আইসিটি যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সারোয়ার মাহমুদ গণমাধ্যমকে বলেন, মুজিববর্ষকে সামনে রেখেই সাইলোর প্রাথমিক কাজ শেষ করতে চাই। এরপর মূল কাজটা শুরু করতে চাই। বর্তমানে দেশে ৫টি বড়ো সাইলো, ১৩টি সেন্ট্রাল সাইলো (বিএসডি) এবং ৬৩১টি লোকাল সাইলো (এলএসডি) আছে। এসব সাইলো বা খাদ্য গুদামের বর্তমান ধারণক্ষমতা প্রায় ২০ লাখ টন।

প্রতিবেদন: আনোয়ার হোসেন

যে ভাষণে অনুরণিত স্বাধীনতা সংগ্রাম

কে সি বি তপু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ সম্মোহনী, তেজস্বিতা, বাগ্মিতা, দৃঢ়তা, সুদূরপ্রসারী চিন্তা, গভীর প্রজ্ঞা ও পরম আন্তরিকতায় স্বাধীনতাকামী উত্তুঙ্গ জাতিকে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশদানে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সক্ষমতায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃপ্ত ঘোষণা সত্ত্বেও আলোচনার দরজাও খোলা রেখে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ব্যতিক্রমী ও অনন্য অসাধারণ। বঙ্গবন্ধুর হৃদয় নিংড়ানো স্বতোৎসারিত এ অলিখিত ভাষণ বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে এক পতাকা তলে সমবেত করে। এ ভাষণ মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। যে ভাষণে জাতি দিক নির্দেশনা পায়, জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বিনির্মাণে উদ্বুদ্ধ হয় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে আনে–এমন একটি কালজয়ী ভাষণ। এ ভাষণে ধ্বনিত 'স্বাধীনতার সংগ্রাম','মুক্তির সংগ্রাম' যে-কোনো কালের যে-কোনো ব্যক্তিকে বিমুগ্ধ, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করবে। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ২০১৭ সালে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতিতে মানবজাতির মূল্যবান সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে।

মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের এই দীর্ঘ পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিক নির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক ছয় দফার ভিত্তিতে প্রণীত ইশতাহারে জনগণের ম্যান্ডেটে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন কিন্তু আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে 'বাঙালির মুক্তি' সূচনা করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ যখন আক্রমণাত্মক কর্মসূচি ঘোষণার পক্ষে তখন বঙ্গবন্ধু দেশব্যাপী ধর্মঘট এবং অহিংস ও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ভাষণের সার্বিক বিষয় ও উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বঙ্গবন্ধু যখন চিন্তামগ্ন তখন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বলেছিলেন, 'সামনে তোমার বাঁশের লাঠি, জনগণ আর পেছনে বন্দুক। এই মানুষদের তোমাকে বাঁচাতেও হবে। তুমি যা বিশ্বাস করো, সেই বিশ্বাস থেকেই আগামীকাল বক্তৃতা করবে।' কারণ বিদ্যমান পটভূমিতে বাংলাদেশের সংগ্রাম কোন রূপ ধারণ করবে, এটা কি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হবে, নাকি স্বাধীনতাকামী মুক্তি আন্দোলনের মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, সেটা নির্ভর করছিল ৭ই মার্চের ভাষণের দিক নির্দেশনার ওপর। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করেছিল। এ ভাষণটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের টার্নিং পয়েন্ট।

এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের একান্ত ও নিজস্ব উচ্চারণ 'ভাইয়েরা আমার' বলে বক্তৃতা শুরু করেন। একেবারে আড়ম্বরহীন এমন অন্তরঙ্গ সম্ভাষণ শুধু বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব ছিল। ভাষণের শুরুই বাঙালির আবেগকে উসকে দিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন-

'আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। ...

... পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করার জন্যে সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে– তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু– আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে বার বার বলেন 'আমার লোক'–যা মানুষের প্রতি তাঁর উদার ভালোবাসা ও একান্ত আন্তরিকতার প্রমাণ। তিনি ভাষণে এক পর্যায়ে কৌশলে 'আর যদি' শব্দ যোগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধের, বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনার আহ্বান জানিয়ে বলেন–

> ... আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে ... ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বীর বাঙালিকে একান্ত আপন ভেবে দৃঢ় বিশ্বাসে পরম করুণাময় স্রষ্টার নামে বলেন-

> ... প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাসের জায়গা থেকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষায় কথা বলেন। সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া বুঝে তারা যা চেয়েছেন, বঙ্গবন্ধু তা-ই তাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এ ভাষণের প্রতিটি শব্দে বাঙালির শিরায় শিরায় আবেগ আর উত্তেজনার ঢেউ খেলে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর এ ভাষণের শেষে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে বজ্রকণ্ঠে

ঘোষণা করলেন অপেক্ষিত ধ্বনি উচ্চারণে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কবি নির্মলেন্দু গুণ 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' শীর্ষক কবিতায় লিখেন–

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা,
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা-
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

একইসঙ্গে এ ভাষণে বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক মনোভাব ফুটে ওঠে। তিনি ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন–'আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো– এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।' বাঙালিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন– 'শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়– হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।' এখানে তাঁর মানবিক গুণাবলি ও দূরদর্শিতা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সমগ্র বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। কোনো ধরনের আপোশের পথে না গিয়ে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে ৩০ লাখ মানুষ জীবন উৎসর্গ করে, যা বিশ্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন। শ্রেষ্ঠ ভাষণের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য– নেতৃত্বের সর্বোচ্চ দেশাত্ববোধ, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির এবং লক্ষ্য অর্জনে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা; এ ভাষণের মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঙালির মুক্তি; সময়ের পরিসীমায় গণ্ডিবদ্ধ না থেকে তা হয় কালোত্তীর্ণ ও প্রেরণাদায়ী; এর কাব্যিক গুণ-শব্দশৈলী ও বাক্যবিন্যাস, যা হয়ে ওঠে গীতিময় ও চতুর্দিকে অনুরণিত এবং সংক্ষিপ্ত। বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত তাৎক্ষণিক এ ভাষণের প্রতিটি শব্দ নির্বাচন করা হয়েছিল অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং প্রয়োজনের নিরিখে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও কৌশলী। তিনি ভাষণের শেষভাগে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' শব্দ উচ্চারণে বাঙালিকে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করলেও আলোচনার দরজা খোলা রাখায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করার সুযোগ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে দেননি।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়কেই নাড়া দেয়নি, ভাষণটি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ ভাষণের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে মুক্তির মোহনায় দাঁড় করিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ঢাকায় অবস্থান করে পরিস্থিতির গুরুত্ব ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তাৎপর্য ভালোভাবে অনুধাবন করে লিখেন, '৭ই

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১, রমনা রেসকোর্স ময়দানে [সোহরাওয়ার্দী উদ্যান] মিত্রবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে

মার্চ প্রদত্ত মুজিবের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার চেয়ে লক্ষণীয় হলো তিনি কী বলেননি।'

পৃথিবীর বহু সমাজবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করেছেন। লন্ডন থেকে প্রকাশিত Sunday Times-এ ভাষণের জন্য বঙ্গবন্ধুকে A poet of politics আখ্যায়িত করেন। পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, '৭ই মার্চের ভাষণ একটি অনন্য দলিল। এতে একদিকে আছে মুক্তির প্রেরণা। অন্যদিকে আছে স্বাধীনতার পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা।' কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেন, '৭ই মার্চের শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুধুমাত্র ভাষণ নয়, এটি একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল।' গ্রেট ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ বলেছেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে যতদিন পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম থাকবে, ততদিন শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণটি মুক্তিকামী মানুষের মনে চির জাগরুক থাকবে। এ ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের জন্য নয়, সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই ভাষণ বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রেখেছে। এই ভাষণের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রস্তুত করেছিলেন। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকেই অনুপ্রাণিত করেছিল তা নয়, বরং এই ভাষণ যুগে যুগে বিশ্বের সকল অবহেলিত ও বঞ্চিত জাতি-গোষ্ঠীকে অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকবে। এ কারণেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি 'ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাক্কালে উত্তাল জনস্রোতের মাঝে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও দিক নির্দেশনামূলক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু স্বাধীনতা যুদ্ধে নয়, আজও বাঙালি জাতিকে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করে। এ ভাষণ মুক্তির চিরন্তন উৎস। সম্ভবত পৃথিবীতে অন্য কোনো ভাষণ এতবার প্রচারিত ও শ্রুত হয়নি। অসীম ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমিত শক্তির উৎস ছিল এই ভাষণ। বহুমাত্রিকতায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এ ভাষণ স্বাধীনতা সংগ্রামী একটি জনগোষ্ঠীর মুক্তির কালজয়ী এক মহাকাব্য। শুধু বাঙালির জন্যই নয়, বিশ্বমানবতার জন্যও অবিস্মরণীয় এবং অনুকরণীয় এক মহামূল্যবান দলিল।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

নিবন্ধ

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ইতিহাস

মোহাম্মদ খালিদ হোসেন

২রা মার্চ বাংলাদেশের 'জাতীয় পতাকা দিবস'। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সবুজ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত। সবুজ রং বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতি ও তারুণ্যের প্রতীক, বৃত্তের লাল রং উদীয়মান সূর্য, স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারীদের রক্তের প্রতীক। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার এই রূপটি ১৯৭২ সালের ১৭ই জানুয়ারি সরকারিভাবে গৃহীত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রায় একইরকম দেখতে একটি পতাকা ব্যবহার করা হতো, যেখানে মাঝের লাল বৃত্তের ভেতর হলুদ রঙের একটি মানচিত্র ছিল। ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি বাংলাদেশের পতাকা থেকে মানচিত্রটি সরিয়ে ফেলা হয়। পতাকার উভয় পাশে সঠিকভাবে মানচিত্রটি ফুটিয়ে তোলার অসুবিধার জন্য পতাকা থেকে মানচিত্রটি সরিয়ে ফেলার অন্যতম কারণ।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যবহৃত পতাকার ওপর ভিত্তি করে এই পতাকা নির্ধারণ করা হয়, তখন মধ্যের লাল বৃত্তে বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল, পরবর্তীতে পতাকাকে সহজ করতেই, মানচিত্রটি বাদ দেওয়া হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, জাপানের জাতীয় পতাকার সঙ্গে মিল থাকলেও কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন– বাংলাদেশের সবুজের স্থলে জাপানিরা সাদা ব্যবহার করে এবং লাল বৃত্তটি একপাশে একটু চাপানো হয়েছে, পতাকা যখন উড়বে তখন যেন এটি পতাকার মাঝখানে দেখা যায়।

১৯৭০ সালের ৭ই জুন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার পল্টন ময়দানে শ্রমিক লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিবাদন জানানোর কর্মসূচি গ্রহণ করে। সে কর্মসূচিতে ছাত্রলীগও সিদ্ধান্ত নেয় গার্ড অব অনার জানানোর। এলক্ষ্যে ছাত্রদের নিয়ে একটি 'জয় বাংলা বাহিনী', মতান্তরে 'ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী' গঠন করা হয়। ছাত্রনেতারা এই বাহিনীর একটি পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। এলক্ষ্যে ১৯৭০ সালের ৬ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের (তৎকালীন ইকবাল হল) ১১৬ (বর্তমানে ১১৭-১১৮) নং কক্ষে ছাত্রলীগ নেতা আ স ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ আহমেদ, মার্শাল মনিরুল ইসলাম পতাকার পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বসেন। এ বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা স্বপন কুমার চৌধুরী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ) ছাত্রলীগ নেতা নজরুল ইসলাম, কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা শিব নারায়ণ দাশ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু ও ছাত্রনেতা ইউসুফ সালাউদ্দিন আহমেদ। সভায় কাজী আরেফের প্রাথমিক প্রস্তাবনার ওপর ভিত্তি করে সবার আলোচনা শেষে সবুজ জমিনের ওপর লাল সূর্যের মাঝে হলুদ রঙের বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। কামরুল আলম খান (খসরু) তখন ঢাকা নিউ মার্কেটের এক বিহারি দর্জির দোকান থেকে বড়ো এক টুকরো সবুজ কাপড়ের মাঝে লাল একটি বৃত্ত সেলাই করে আনেন; এরপর ইউসুফ সালাউদ্দিন আহমেদ ও হাসানুল হক ইনু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েদে আজম হল (বর্তমানে তিতুমীর হল)-এর ৩১২নং কক্ষের এনামুল হকের কাছ থেকে মানচিত্রের বই নিয়ে ট্রেসিং পেপারে আঁকেন পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র। ছাত্রনেতা শিব নারায়ণ দাশ পরিশেষে তার নিপুণ হাতে মানচিত্রটি লাল বৃত্তের মাঝে আঁকেন।

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ২৩শে মার্চ তাঁর বাসভবনে, স্বাধীনতা ঘোষণার প্রাক্কালে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার শিব নারায়ণ দাশের ডিজাইনকৃত পতাকার মাঝে মানচিত্রটি বাদ দিয়ে পতাকার মাপ, রং ও তার ব্যাখ্যা সংবলিত একটি প্রতিবেদন দিতে বলে পটুয়া কামরুল হাসানকে। কামরুল হাসান দ্বারা পরিমার্জিত রূপটিই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা।

পতাকার আয়তন এবং বর্ণনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ অনুযায়ী জাতীয় পতাকা মাপের সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিম্নলিখিত:

* জাতীয় পতাকা গাঢ় সবুজ রঙের হবে এবং ১০ঃ৬ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার সবুজ রঙের মাঝখানে একটি লাল বৃত্ত থাকবে।

* লাল বৃত্তটি পতাকার দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। পতাকার দৈর্ঘ্যের নয়-বিংশতিতম অংশ হতে অঙ্কিত উলম্ব রেখা এবং পতাকার প্রস্থের মধ্যভাগ হতে অঙ্কিত আনুভূমিক রেখার পরস্পর ছেদ বিন্দুতে বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু হবে। অর্থাৎ পতাকার দৈর্ঘ্যের বিশ ভাগের বাম দিকের নয় ভাগের শেষ বিন্দুর ওপর অঙ্কিত উলম্ব এবং প্রস্থের দিকে মাঝখান বরাবর অঙ্কিত সরল রেখার ছেদ বিন্দু হলো বৃত্তের কেন্দ্র।

রং

পতাকার সবুজ পটভূমি হবে প্রোসিয়ন ব্রিলিয়ান্ট গ্রিন এইচ-২ আর এস ৫০ পার্টস পার ১০০০ হবে এবং লাল বৃত্তাকার অংশ হবে প্রোসিয়ন ব্রিলিয়ান্ট অরেঞ্জ এইচ-২ আর এস ৬০ পার্টস পার ১০০০ হবে।

পতাকা ব্যবহারের মাপ

ভবনে ব্যবহারের জন্য পতাকার আয়তন

ক. ১০' x ৬'

খ. ৫' x ৩'

গ. ২.৫' x ১.৫'

ভবনের আয়তন অনুযায়ী এবং প্রয়োজনে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ঠিক রেখে বড়ো আয়তনের পতাকা প্রদর্শনের অনুমতি সরকার দিতে পারে।

গাড়িতে ব্যবহারের জন্য পতাকার আয়তন

ক. ১৫" x ৯" (বড়ো গাড়ির জন্য)

খ. ১০" x ৬" (ছোটো এবং মাঝারি আকারের গাড়ির জন্য)

আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক কনফারেন্সের জন্য টেবিল পতাকার আয়তন

১০" x ৬"

ব্যাখ্যা

ক. পতাকার দৈর্ঘ্য ১০' হলে প্রস্থ ৬' হবে।

খ. পতাকার লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে ২'।

গ. বাম দিক থেকে পতাকার দৈর্ঘ্যের ৪.৫' থেকে একটি উলম্ব রেখা টানতে হবে এবং পতাকার প্রস্থের মধ্যভাগ থেকে একটি আনুভূমিক রেখা টানতে হবে।

ঘ. এই উভয় রেখার ছেদ বিন্দুটি হবে লাল বৃত্তের কেন্দ্র।

পতাকার ব্যবহারবিধি

১. গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন এবং অফিসসমূহ, যেমন– রাষ্ট্রপতির বাসভবন, সংসদ ভবন, সকল মন্ত্রণালয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সচিবালয় ভবনসমূহ, হাইকোর্টের অফিসসমূহ, জেলা ও দায়রা জজ আদালতসমূহ, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক/কালেক্টর, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের অফিসসমূহ, কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহ, পুলিশ স্টেশন, শুল্ক পোস্টসমূহে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ভবনসমূহে সকল কর্মদিবসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়।

২. নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের অফিসিয়াল বাসভবনে 'পতাকা' উত্তোলিত থাকবে:

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রিবর্গ, চিপ হুইপ, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা, মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, প্রতিমন্ত্রিবর্গ, প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, উপমন্ত্রী, উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক/কনস্যুলার মিশনসমূহের প্রধানগণ, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানগণ।

৩. রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মোটরযান, জলযান এবং উড়োজাহাজে 'বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলন করা হবে।

৪. নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের মোটরগাড়ি ও জলযানে 'বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলন করা হবে যথা: জাতীয় সংসদের স্পিকার, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রিবর্গ, চিফ হুইপ, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা, মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক/কনস্যুলার মিশনসমূহের প্রধানগণ।

৫. প্রতিমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, উপমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ রাজধানীর বাইরে দেশের ভিতরে অথবা বিদেশে ভ্রমণকালীন সময়ে তাঁদের মোটরযান এবং জলযানে 'বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলন করতে পারবেন।

যেসব উপলক্ষে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে

নিম্নবর্ণিত দিবস এবং উপলক্ষে বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনসমূহে এবং বিদেশে অবস্থিত কূটনৈতিক মিশন ও কনস্যুলার পোস্টসমূহে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে 'বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলন করতে হবে:

ক. মহানবির জন্ম দিবস (ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি)

খ. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস

২৩শে মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমন্ডি ৩২নং রোডের নিজ বাড়িতে উচ্ছ্বসিত জনতার মাঝে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলেন

গ. ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস

ঘ. সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিকৃত অন্য যে-কোনো দিবস

নিম্নবর্ণিত দিবসসমূহে পতাকা অর্ধনমিত থাকে

ক. ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস (যা এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)

খ. ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

গ. সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিকৃত অন্য যে-কোনো দিবস

পতাকা অর্ধনমিত হবে খুঁটির ওপর থেকে পতাকার প্রস্থের সমান নিচে।

বহির্বিশ্বে পতাকা উত্তোলন

১৯৭১ সালের ১৮ই এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনের প্রধান এম হোসেন আলী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এটিই বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর বর্তমানে মুজিব নগরের আম্রকাননে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদ ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের একটি পতাকা, পেয়েছি একটি দেশ 'বাংলাদেশ'। তাই এই পতাকার মান রাখতে আমরা সবাই সজাগ থাকব– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনে এটাই হবে আমাদের প্রতিজ্ঞা।

লেখক: গবেষক ও সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন সংগ্রামের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য

আলী হাসান

বাঙালি জাতি ও রাষ্ট্রের পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম স্বপ্ন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের। কেননা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের মধ্যেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকল ধর্মের মানুষের পূর্ণ অধিকার স্থাপন করা যাবে বলে বঙ্গবন্ধুর অটল বিশ্বাস ছিল। পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের ভয় ছিল এই জায়গাটিতেই। প্রথমেই বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেননি, কোনো রাজনৈতিক মতবাদের গূঢ় তত্ত্বও হাজির করেননি। ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিও প্রথমেই সামনে আনেননি। সার্বিকভাবে তিনি জোর দিয়েছেন একমাত্র বাঙালির স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার– যার একমাত্র মাধ্যম স্বায়ত্তশাসন।

১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের গণপরিষদে গৃহীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে করা হয়েছিল পূর্ববঙ্গের নাম পূর্ব পাকিস্তান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে– সদ্য গৃহীত পাকিস্তানের এ সংবিধানে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তখন একটি বিষয় খুবই জোরালোভাবে ওঠে আসলো সেটি হচ্ছে– আমরা মুসলমান আগে, না কি বাঙালি আগে। কথাটা অন্যভাবে ঘুরিয়েও বলা যায়– আমরা বাঙালি আগে না কি পাকিস্তানি আগে। এর আগে এই বিষয়টি নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবতারণা হয়নি, বিধায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছেও এই টার্মটি ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রিষ্টান– এরা সকলেই যেহেতু পাকিস্তানের নাগরিক তাই তারা সবাই নাগরিক হিসেবে পাকিস্তানি– এটা মেনে নিতে তো অসুবিধা নেই– কিন্তু জাতি হিসেবে তো আমরা বাঙালি। এই পরিচয় এ ভূখণ্ডের মানুষ হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় পেয়েছে। তাই পাকিস্তানি শাসকরা যখন এ দেশের মানুষের পরিচয় থেকে 'বাঙালি' শব্দটা মুছে দিতে চাইল তখনই এ ভূখণ্ডের মানুষ বিদ্রোহ করতে শুরু করল। বিদ্রোহ ও আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়ই এল ৬ দফার প্রস্তাব।

বাঙালির নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ পল্টন ময়দানে ৬ দফা আন্দোলনের সূচনা সভায় বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে বলেছেন যেন তাঁর অবর্তমানে এই সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে এমনও বলেছেন যে– পাকিস্তান সরকার যেভাবে সকল শ্রেণির সংগ্রামী নেতাদের গ্রেপ্তার করা শুরু করেছে তাতে হয়তো কেউই আর কারাগারের বাইরে থাকবে না– সকলকেই গ্রেপ্তার করে এই আন্দোলন সংগ্রাম স্তব্ধ করে দিতে সচেষ্ট হবে ওরা। তবে কোনো অবস্থাতেই যেন এই ৬ দফা আন্দোলনের গতি স্তিমিত না হয়, সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন। আসলে বঙ্গবন্ধু এক চূড়ান্ত বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে– এই ৬ দফার মাধমেই বাঙালির জন্য এই ভূখণ্ডটি স্বাধীন হবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর লক্ষ্য অর্জনে সর্বদাই স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। এর পেছনের কারণটি ছিল– তিনি যেসব পরিকল্পনা করতেন তার নেপথ্যে তিনি যৌক্তিভাবেই এমন কিছু সুনির্দিষ্ট দাবি ও কর্মসূচিকে জুড়ে দিতেন যা ছিল সম্পূর্ণতই সময়োপযোগী। আলোচনার কোনো সুযোগ হলে কখনো তিনি পিছু হঠতেন না বা আলোচনা বর্জনও করতেন না। তিনি আলোচনায় অংশ নিয়ে তাঁর যৌক্তিক দাবিগুলো তুলে ধরতেন– কিন্তু যদি আলোচনা ভেঙে যেতো কিংবা ফলপ্রসূ না হতো তাহলে তিনি হতাশাগ্রস্ত না হয়ে পুনরায় আন্দোলন সংগ্রামের ডাক দিতেন।

বিশাল গণসমাবেশে জনগণের সামনে তিনি তাঁর যুক্তিগুলো তুলে ধরতেন। জনসাধারণকে তিনি বুঝাতেন যে তিনি বিশৃঙ্খলা চান না, তিনি চান একটি স্বস্তিদায়ক পরিবেশ– কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা তা মানছেন না বলেই তিনি আবার সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। তখনকার রাজনৈতিক যে অচলাবস্থা সে অবস্থায় তিনি ঠিকই বুজেছিলেন যে এ পরিস্থিতিতে চলমান সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা। প্রস্তাবিত এ স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাকে অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। এ জন্যই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশি মুদ্রা অর্জনের ওপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাদানের ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তখন মনে করা হয়েছিল বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ আলোচনার ক্ষমতাও ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত।

৬ দফার অন্তর্ভুক্ত উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে বঙ্গবন্ধু '৬৬ সালের এপ্রিলের শুরু থেকে ৮ই মে পর্যন্ত উল্কার মতো সারা পূর্ব পাকিস্থানের অনেকগুলো জেলায় বিরাটাকারের জনসভায় বক্তৃতা করে বেড়ালেন। এর ফলে ৬ দফা দাবি দ্রুতই এ ভূখণ্ডের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। ৬ দফার দাবিগুলো যে এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বিপরীতে অধিকার আদায়ের আসল দলিল– সেটা তারা পুরোপুরি অনুধাবন করতে সক্ষম হলো বিধায় দাবিগুলো সকল শ্রেণির মানুষের প্রাণের দাবি হয়ে উঠলো। পাকিস্তান রাষ্ট্র হবার পর থেকেই এ অঞ্চলের মানুষের সেই যে আশাভঙ্গের শুরু হয়েছিল এবং এ দেশের মানুষের ওপর যে অত্যাচার ও নির্যাতনের খরগহস্ত নেমে এসেছিল তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই ৬ দফার মুক্তি আন্দোলনই ছিল একমাত্র উপায়, তা তারা বুঝতে তখন সক্ষম হয়েছিল।

১৯৫৭ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে আলাদা দল গঠন করার পর পুরো আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন শেখ মুজিব একা। তাঁর একক নেতৃত্বেই স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে এ দেশের সংগ্রামী সাধারণ মানুষ। বলা যায়, পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত নেতৃত্বের প্রধানতম স্তম্ভ ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একটি জাতিকে বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের ভেতর দিয়ে কীভাবে সর্বোচ্চ ত্যাগী ও দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন জাতিতে পরিণত করা যায়, বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্বে ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁক পরিবর্তনের আন্দোলন সংগ্রামগুলো তার যথোপযুক্ত দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতাপূর্ব তাঁর বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম ও সীমাহীন কারা নির্যাতন ভোগ তাঁকে এ দেশের মাটি ও মানুষের জন্য এক অপরিহার্য রাজনৈতিক প্রতিভূতে পরিণত করেছিল– বিধায় এ দেশের মানুষ তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করেছিল। আর তিরিশ লক্ষ তাজা প্রাণ, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানিসহ অপরিসীম ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের পর তাকে এ জাতি 'জাতির পিতা' পরিচয়ে পরম আদরে গ্রহণ করেছিল। তবে এটাও বাড়িয়ে বলা নয় যে– 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির পিতা' এই দুই অভিধাপ্রাপ্তি শেখ মুজিবের জন্যও এক বিশাল পাওয়া। এ দেশ ও এ জাতি যতদিন পৃথিবীতে টিকে থাকবে ততদিনই যে এই মহান দুটি অভিধা শেখ মুজিবুর রহমান নামের এক মহান ব্যক্তির নামের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লেখক: গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকর্মী

কৃষকবান্ধব বঙ্গবন্ধুর পথেই নিহিত আগামীর সমৃদ্ধি

মোতাহার হোসেন

এ বছর উদযাপিত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে বছরব্যাপী নানা কর্মসূচি। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ই জানুয়ারি থেকে 'মুজিববর্ষের' ক্ষণগননা শুরু হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ই মার্চকে সামনে রেখে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার কাউন্ডডাউন চলছে। এ কারণে এবারের বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একইসঙ্গে জাতির সামনে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে নতুনভাবে প্রকাশিত হবে বঙ্গবন্ধুর জীবন, দর্শন, রাজনীতি, আদর্শ, সংগ্রাম প্রভৃতি। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, তাঁর স্বপ্ন প্রভৃতি নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হবে নতুন প্রজন্মের কাছে। কাজেই মুজিববর্ষের বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালা, আলোচনাসভা, সমাবেশ, সেমিনার, র‍্যালি, প্রদর্শনী, গ্রন্থ প্রকাশনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মশাল নিয়ে উজ্জ্বল আগামীর পথে– আলোর পথযাত্রায় শামিল হবে নতুন প্রজন্ম। এরাই জাতিকে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে ও অসমাপ্ত স্বপ্ন পূরণে। আর এই গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষি-কৃষক নিয়ে জাতির পিতার ভাবনা, চিন্তা-চেতনা, কর্মকাণ্ড আলোচনা হওয়া দরকার। এটাও সত্য, দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়ন, করণীয়, বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে শত ভাগ ওয়াকিবহাল, ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর সারা জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, সাধনা, রাজনীতি ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং মানুষের আত্মমার্যাদা প্রতিষ্ঠা ও অধিকার আদায়। সর্বোপরি বিশ্বে বাঙালিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা।

এদেশের যা-কিছু তা হোক না নগণ্য, ক্ষুদ্র তাঁর চোখে মূল্যবান ছিল। নিজের জীবনই শুধু/ তাঁর কাছে খুব তুচ্ছ ছিল; স্বদেশের মানচিত্রজুড়ে পড়ে আছে বিশাল শরীর...' -রফিক আজাদ (এই সিঁড়ি)। কবির এই কবিতা এখানে প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথপ্রদর্শক। তিনি শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি বাংলার প্রত্যেক মানুষের জীবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আহার, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ে তিনি ছিলেন আপোশহীন। বিপন্ন জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি জনগণের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। এজন্য সারা জীবন জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন, এমনকি ফাঁসির মঞ্চও তাঁর লক্ষ্য থেকে তাঁকে একচুলও সরাতে পারেনি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও বঙ্গবন্ধু বিজয়ীর বেশে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি ফিরে আসেন স্বাধীন বাংলাদেশে। ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় জনগণের মাঝে। নিজেকে সঁপে দেন দেশ গড়ার কাজে। শুরু হয় জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন এদেশের শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। তাই তিনি সব সময় কৃষির প্রতি শ্রদ্ধা ও অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিশেষভাবে উপলব্ধি করতেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রয়োজন কৃষি ও কৃষকের উন্নতি। আর এই গুরুত্ব বিবেচনা করেই তিনি ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদাদান করেন। এর আগে ১৯৭০ নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে কয়েক লক্ষ লোকের সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের সদস্যগণ জনগণের সামনে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করানোর পর বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই কৃষকের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেয়া হবে। আর দশ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না। অর্থাৎ সকলের খাজনা মাফ করে দেওয়া হবে। পশ্চিম পাকিস্তানেরবেলায়ও এই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। ঐ সমাবেশে তিনি আরো বলেন, আইয়ুবী আমলে বাস্তুহারা হয়েছে বাংলার মানুষ। সরকারের খাস জমিগুলো বণ্টন করা হয়েছে ভুঁড়িওয়ালাদের কাছে। তদন্ত করে এদের কাছ থেকে খাসজমি কেড়ে নিয়ে তা বণ্টন করা হবে বাস্তুহারাদের মধ্যে। চর এলাকায়ও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।'

স্বাধীন বাংলাদেশের কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে বঙ্গবন্ধু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সদ্য স্বাধীন দেশের ৩০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণে বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক আমদানির মাধ্যমে এবং

স্বল্পমেয়াদে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ ও অন্যান্য কৃষি-উপকরণ সরবরাহ করা হয় এবং কৃষকের কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও খাসজমি বিতরণ করে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে কৃষকদের সব রকম সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষিদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।' তিনি কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্যে প্রথম দেশে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। একইসঙ্গে উন্নত বীজ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেন, উচ্চতর কৃষি গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি বলেন, আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিন গুণ ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে দ্বিগুণ ফসল করতে পারবো না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। ... আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে, যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট পরা, কাপড় পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই– জমিতে যেতে হবে, দ্বিগুণ ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ঐ শহিদদের কথা স্মরণ করে দ্বিগুণ ফসল করতে হবে। যদি দ্বিগুণ ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না।' ১৯৭৫ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁর জীবনের সর্বশেষ জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রসঙ্গত ১৯৭৩ সালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি-অবকাঠামো

পুনর্নির্মাণ ও কৃষি-যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্যে হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প, ২৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩০০০টি অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭২ সালের মধ্যেই জরুরিভিত্তিতে বিনামূল্যে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্যে ১৬,১২৫ টন ধানবীজ, ৪৫৪ টন পাটবীজ ও ১০৩৭ টন গমবীজ সরবরাহ করা হয়। পাকিস্তানি শাসনকালে রুজু করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেওয়া হয় ও তাদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করে দেওয়া হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরদিনের জন্যে রহিত করা হয়। আগের সমস্ত বকেয়া খাজনাও মাফ করা হয়। ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকারের সময় প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কৃষি-উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। ঐ সময় দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। বিরাজমান খাসজমির সাথে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণযোগ্য জমির সরবরাহ বৃদ্ধির জন্যে বঙ্গবন্ধু পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মালিকানার পরিধি কমিয়ে এনে পরিবারপিছু জমির সিলিং ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করে দেন। ১৯৬৮-১৯৬৯ সালের ১১ হাজার শক্তিচালিত পাম্পের স্থলে ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে এই সংখ্যা ৩৬ হাজারে উন্নীত করা হয়। এর ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লাখ একরে উন্নীত হয়। বিশ্ববাজারে রাসায়নিক সারের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির কারণে সারে ভরতুকি দিয়ে কৃষককে রক্ষা করেন বঙ্গবন্ধু।

শিক্ষিত মানুষকে গ্রামমুখী এবং কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ কারণে ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহে বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে প্যান্ট, কোট ছেড়ে মাঠে না নামলে বিপ্লব করা যাবে না, তা যতই লেখাপড়া করা যাক, তাতে কোনো লাভ হবে না। আপনাদের কোট-প্যান্ট খুলে একটু গ্রামে যেতে হবে।' বঙ্গবন্ধুর এসব সচেতন ও কৃষকদরদি নীতির ফলে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল তারই ফলে আজ কৃষিক্ষেত্রে শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সরকার যে কল্যাণধর্মী ও কৃষকবান্ধব উন্নয়ন নীতি কৌশল গ্রহণ করেছে তা বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনারই প্রতিফলন। দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। সেদিকে খেয়াল রেখেই বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে যাতে সুবিধাবঞ্চিত এই সম্ভাবনাময় জনশক্তিকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তির যে আকাশছোঁয়া অগ্রগতি হয়েছে তার সুফল কী করে কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায় সেই ভাবনাই চলছে। কৃষকদের ভূমির অধিকার, ঋণপ্রাপ্তির অধিকার, উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য পাবার অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা ও সন্তানদের শিক্ষা পাবার অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সরকার কৃষক ও কৃষির কল্যাণে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সার, কীটনাশক, বীজ, সেচে নিয়মিত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন খরচ কমানোর জন্যে সার, বীজ, সেচসহ কৃষি উপকরণে ভরতুকি সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বাড়ানো এবং কৃষি গবেষণা, জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক প্রকৌশল ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আমাদের কৃষিবিজ্ঞানীরা খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এ কাজে জড়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতোমধ্যে প্রায় শতাধিক জাতের ধানসহ অন্যান্য জাতে শস্য, বীজ উদ্ভাবন করা হয়েছে আরো ৫০০ জাতের ফসল। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির কথা বিবেচনা করে বর্তমান সরকারের নেওয়া নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি উৎপাদন খরচ হ্রাসে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ, সমবায় মার্কেট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্যে দরকার কৃষকের নিজস্ব জমির ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনের সময় কম দামে কৃষকদের সার ও কীটনাশক সরবরাহ করা, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য দেওয়া, পচনশীল ফসল সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কম দামে সেচযন্ত্র ও অন্যান্য কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এসব কিছুরই সূচনা করে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মূলত কৃষক ও কৃষির উন্নতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের কল্যাণ। কৃষির মধ্যে নিহিত রয়েছে দেশের সমৃদ্ধি। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণে কৃষি ও কৃষকের প্রতি তাঁর যে হৃদয়ের গভীর টান ছিল সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে- '৯০ শতাংশ কৃষক গ্রামে বাস করে। গ্রামের দিকে যেতে হবে। আমার ইকোনমি যদি গণমুখী করতে না পারি এবং গ্রামের দিকে যদি না যাওয়া যায়, সমাজতন্ত্র কায়েম হবে না, কৃষিবিপ্লব হবে না।' কৃষি ও কৃষকের প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর মমত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। সেজন্যই তিনি সবসময় দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা গঠনে কৃষি ও কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত কৃষিবিদদের কল্যাণে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোটা কৃষিব্যবস্থাকে ব্যাপক আধুনিকীকরণ ও লাগসই উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু কৃষি ও কৃষকের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করে গেছেন, তা সত্যিই আমাদের জন্য বিশাল গর্বের।

বিখ্যাত দার্শনিক রুশো বলেছিলেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ও গৌরবমণ্ডিত শিল্প হচ্ছে কৃষি।' শতাব্দীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিজ্ঞানমনস্ক। আধুনিক রাজনৈতিক নেতা। তিনিও দার্শনিক রুশোর বাণীকে লালন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি সোনার বাংলা গড়তে কৃষিশিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য। তিনি উপলব্ধি করতেন, কৃষি একটি জ্ঞাননির্ভর শিল্প। গতানুগতিক কৃষিব্যবস্থা দ্বারা দ্রুত ক্রমবর্ধমান বাঙালি জাতির খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য চাই কৃষির ব্যাপক আধুনিকীকরণ। আর কৃষিশিল্পের আধুনিকীকরণ ও লাগসই উন্নয়নের একমাত্র কারিগর হচ্ছেন কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটরা। এজন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের ১১ দফায় কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আত্মমর্যাদাশীল কৃষিবিদরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে দেশের বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠীর খাদ্য জোগানে নিয়োজিত রয়েছেন। কৃষিবিদদের চিন্তাচেতনা, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, আধুনিক প্রযুক্তিগত ধারণা ও প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ উপহার আজ সময়ের দাবি।

কৃষির সার্বিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু যে মমত্ববোধ ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত ভাষণটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আজও সাক্ষ্য দেয়। এ দিনটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি গৌরবময় দিন। বঙ্গবন্ধু শত ব্যস্ততার মধ্যেও কৃষি ও কৃষকের টানে ছুটে এসেছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ শ্যামল আঙিনায়। এদেশের কৃষি, কৃষক ও কৃষিবিদদের সঙ্গে যে তাঁর আত্মার সম্পর্ক ছিল তা প্রদত্ত ভাষণে তিনি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি। সবুজ বিপ্লবের কথা আমরা বলছি। যুগ যুগ

ধরে বাংলাদেশের যে অবস্থা, সত্য কথা বলতে কী বাংলার মাটি, এ উর্বর জমি বারবার দেশ-বিদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ও শোষকদের টেনে এনেছে এই বাংলার মাটিতে। বঙ্গবন্ধু কৃষি ও কৃষক তথা আপামর জনগণের মুক্তির জন্য আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর প্রদত্ত ভাষণ থেকে তা সহজেই অনুমেয়। তিনি ছিলেন আবহমান বাংলার একজন পথচারী। বংলার মাটির সাধারণ মানুষ।

এ উপমহাদেশের আর এক জাতির পিতা ও অসহযোগ আন্দোলনের পথিকৃৎ মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, 'একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি এক টুকরো রুটির মধ্যে স্রষ্টাকে দেখেন।' বঙ্গবন্ধু এই ঐতিহাসিক বাণী উপলব্ধি করে বলেছিলেন, 'খাবার অভাব হলে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। সেজন্য খাওয়ার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে অন্নহীন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে।' এলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার জন্য বাঙালি জাতি যখন অগ্রসরমাণ, ঠিক তখনই দেশি-বিদেশি কুচক্রী মহল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোরে বঙ্গবন্ধুর নিজ বাসভবন ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর একটি স্বাধীনতাবিরোধী কুচক্রী মহলের হস্তক্ষেপে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আর আশার আলো দেখেনি। বরং কৃষি খাতে ভরতুকি প্রত্যাহার, অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার ফলে বিগত দিনগুলোতে বিপুল সম্ভাবনাময় কৃষি খাতে উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি।

১৯৯৬ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টি উন্নয়ন, মহিলাদের কৃষিতে অংশগ্রহণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কয়েকটি বছর আবার কৃষি খাতের উন্নয়ন থমকে ছিল। ২০০৮ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত শক্তি আবার ক্ষমতায় এলে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কৃষি খাতে আবার ভরতুকি, সার বিতরণ ব্যবস্থা, সেচব্যবস্থার উন্নয়ন, একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্প, শস্য বহুমুখীকরণসহ অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন আগে যেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল প্রায় এক কোটি টন সেখানে ২০০৮-২০০৯ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে প্রায় তিন কোটি ১২ লাখ টন অর্থাৎ শস্যের উৎপাদন প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রায় চার কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হচ্ছে। অভ্যন্তরীণভাবে দেশে খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত খাদ্য সীমিত হারে রপ্তানি করা হচ্ছে। একইসঙ্গে মৎস্য, গরু, মাছসহ কৃষি সেক্টরের অন্যান্য খাতেও উৎপাদন বাড়ছে ঊর্ধ্বমুখী হারে। কৃষকদের মনে রাখতে হবে 'এদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা বাঁচলে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থাকলে বাংলাদেশ বাঁচবে; বাংলাদেশ থাকবে, থাকবে স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। সর্বোপরি বলা যায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুই ছিলেন কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের চিরচেনা কৃষির পথপ্রদর্শক। বঙ্গবন্ধুর পথ, তাঁর স্বপ্ন, আদর্শ অনুসরণেই কৃষকের উন্নয়ন ও কৃষির উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা। তাঁর নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠা হবে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

মুজিব কোট

শ্যামল কুমার সরকার

বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর আদর্শ ও পোশাকসহ সব কিছুতেই তাঁকে অনুকরণ করা হতো। শুধু সমকালীন নয়, বর্তমান প্রজন্মও তাঁকে অনুসরণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোট ব্যবহার করতেন। হাতা-কাটা কোট বঙ্গবন্ধু সাদা পাঞ্জাবির ওপর প্রায়ই পড়তেন। এমন কোট সুদর্শন বঙ্গবন্ধুকে বিশেষ শোভা দান করত। বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশাতেই মডেলে পরিণত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর বিশেষ পোশাক ছিল সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা আর ৬ বোতামের কালো কোট। ৬ বোতামের কালো কোটটি পরবর্তীতে মুজিব কোট নামে বেশ পরিচয় পায়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বহন করে এই মুজিব কোট। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফাই মূলত মুজিব কোটের ৬ বোতাম। বঙ্গবন্ধু কোট পরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে নতুন এক বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছেন। এই পোশাক পরেই বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিয়েছেন– বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, সর্বোপরি নিজেকে বাঙালির ফ্যাশন আইকন হিসেবে বিশ্বের দরবারে হাজির করেছেন।

বর্তমানে আওয়ামী লীগের বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা এই মুজিব কোট পড়ে থাকেন। তরুণ প্রজন্মের কাছেও বেশ জনপ্রিয় এই মুজিব কোট। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ক্ষেত্রে বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হলেও তাঁর ব্যবহৃত কোটের মডেল 'মুজিব কোর্ট'-এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, জননেত্রী ও সফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জরুরি হস্তক্ষেপ সময়ের দাবি। পাশাপাশি ব্যথিত হয়েছি আমাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি একটি গোষ্ঠীর অবমাননা দেখে। আমাদের জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি মর্যাদার সাথে বিভিন্ন দপ্তরে স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর পরিহিত কোট যা মডেল মুজিব কোট হিসেবে আখ্যায়িত তার মর্যাদা রক্ষারও আইনগত উদ্যোগ নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। মুজিববর্ষেই মুজিব কোটের অপব্যবহার রোধের আইনি উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

লেখক: প্রাবন্ধিক, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, ঝিটকা খাজা রহমত আলী কলেজ, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ

অমর একুশে গ্রন্থমেলা: প্রাণের মেলা

রেহানা শাহনাজ

বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ২রা ফেব্রুয়ারি শুরু হয় অমর একুশের গ্রন্থমেলা, প্রাণের মেলা। এ মেলার আয়োজন করে বাংলা একাডেমি। নান্দনিক ডিজাইনে নির্মাণ করা হয় সুন্দর সুন্দর প্যাভেলিয়ন। ঝলমলে স্টলগুলো সাজানো হয়েছিল প্রথম দিন থেকেই। গ্রন্থমেলায় প্রবেশ করতেই পাঠকের মন ভালো হয়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০-এর উদ্‌বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন–পিআইডি

স্টলে-স্টলে সাজানো ছিল বই। ছিল না ধুলোর বাড়াবাড়ি। প্যাভেলিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মেলা দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছিল। মেলা প্রাঙ্গণে চলার পথ ছিল চওড়া, মেলায় ঘুরে ফিরে ক্লান্ত লাগলে বসে জিরিয়ে নেবার জন্য ছিল বেঞ্চ। এই বিন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমি ধন্যবাদ পেতেই পারে। মেলা শুরু হওয়ার অনেকদিন আগেই প্রকাশকরা প্যাভেলিয়ন ও স্টল বুঝে পেয়েছিল, ফলে সাজসজ্জা শেষে গুছিয়ে বসতে পেরেছিল প্রকাশকরা।

রাজধানীর বাংলা একডেমি প্রাঙ্গণে ২রা ফেব্রুয়ারি অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০২০ উদ্‌বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মান আরো উন্নত করে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চায়। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'আমাদের সাহিত্যের আরো অনুবাদ হোক। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী আমাদের সাহিত্যকে জানুক, আমাদের সংস্কৃতিকে জানুক– এটাই আমরা চাই।'

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রজীবনের মতো বইমেলায় সময় কাটাতে না পারায় আক্ষেপ করে বলেন, এই বইমেলা বা গ্রন্থমেলা আমাদের প্রাণের মেলা। আগে যেমন ছাত্রজীবনে এই মেলায় গিয়েছি দিনের পর দিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম এবং ঘুড়ে বেড়াতাম বই মেলায়। পুরো সময় পারলে কাটাতাম। সেটা আর এখন হয়ে ওঠে না এই দুঃখ এখনো থেকে যাচ্ছে। এই স্বাধীনতা আর পাচ্ছি না। তারপরও আমি বলব এই বই মেলা ভালো লাগে।

বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে যে খাতা পাঠাতেন, তাতেই বঙ্গবন্ধু লেখা শুরু করেছিলেন, তা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'কারাগারে তিনি যখন ছিলেন, আমার মা সবসময় লেখার খাতা কিনে দিয়ে কিছু লেখার অনুরোধ করতেন। সেই থেকে বাবার লেখা শুরু।'

গ্রন্থমেলা উদ্‌বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। এ বছর বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলা 'বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ' পালন উপলক্ষে তাঁর প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। গ্রন্থমেলার বাড়তি আকর্ষণ ছিল 'মুজিববর্ষ'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গ্রন্থমেলা ছিল বঙ্গবন্ধুময়। বাংলাদেশের মহান স্থপতিকে শ্রদ্ধা জানাতে মেলার বিভিন্ন অংশ সাজানো হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও বাণী দিয়ে। ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও জীবনী।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মেলাকে ৪টি ভাগে ভাগ করে সাজানো হয়। শিকড়, সংগ্রাম, মুক্তি ও অর্জন– এই চার ভাগে ভাগ করে বঙ্গবন্ধুর জীবনের পথচলাকে নানা আয়োজনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। মেলার প্রথম দিনেই প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর লেখা 'আমার দেখা নয়া চীন'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেলামঞ্চে উক্ত গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন। এছাড়াও অধিকাংশ প্রকাশনী সংস্থা প্রকাশ করেছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা নানান বই।

মেলা উদ্‌বোধন করার পরই পাঠকের আনাগোনা মেলায় প্রাণসঞ্চার করে। সেই চিরচেনা দৃশ্য। উৎসুক নয়ন মেলে হাজার হাজার দর্শক-ক্রেতা অপেক্ষায় ছিলেন আগে থেকেই। গ্রন্থমেলার দ্বার উন্মোচন হতেই বাঁধভাঙা জলোচ্ছ্বাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে অসংখ্য বইপ্রেমী।

আগ্রহ ভরে স্টলে স্টলে গিয়ে পাঠকরা নেড়েচেড়ে দেখেন বই। অনেকেই খোঁজ করেন তার প্রিয় লেখকের বইটি। সমগ্র মেলা মাসেই প্রিয় লেখকের নতুন বইয়ের মন মাতানো ঘ্রাণ বুকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন পাঠক। ১৯৭২ সালে ইউনেস্কো এই বছরকে আন্তর্জাতিক 'গ্রন্থবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে। সেই থেকে গ্রন্থমেলা শুরু।

একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন জাতীয় মননের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই ১৯৮৪ সাল থেকে গ্রন্থমেলার আনুষ্ঠানিক নাম রাখা হয় 'অমর

একুশে গ্রন্থমলা'। মাসব্যাপী গ্রন্থমেলা পৃথিবীর কোথাও হয় না। বাংলাদেশের মানুষ ভাষার জন্য জীবন দিয়ে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে। সেই কারণেই অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রাণের মেলায় পরিণত হয়।

ঘুরে ফিরে বেড়ানো, আড্ডা দেওয়ার জন্যও বেশ সুন্দর খোলামেলা জায়গা ছিল একুশের গ্রন্থমেলায়। তরুণ পাঠকদের আড্ডা জমে উঠেছিল মেলার ফাঁকা স্থানগুলোতে। স্টলের সামনে পাঠকদের উপচেপড়া ভিড়ও জমে উঠেছিল। নতুন নতুন বই ও মোড়কের ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল স্টলগুলো। শিশু-কিশোররা যেমন বাবা-মায়ের সঙ্গে মেলায় এসেছিল তেমনি সব বয়সের ক্রেতা-দর্শক বইয়ের স্টলে ঘুরে ঘুরে খুঁজে নিয়েছিল প্রিয় লেখকের বই।

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা একইসঙ্গে জ্ঞানের মেলা এবং মানবিক ও সৃজনশীলতার আত্মিক উৎসব। মেলা শুরু হয়েছে এবছর একদিন পরে অর্থাৎ ২রা ফেব্রুয়ারি। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের কারণে মেলা পিছিয়েছিল একদিন। তবে এবারের একুশের গ্রন্থমেলা আরো বড়ো আয়োজনে এবং বিশাল ব্যাপ্তিতে শুরু হয়। এর আগে কখনো মেলা এত বড়ো পরিসর নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়নি। স্টলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্টল ও মেলার পরিসর, আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎকে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিচয় বহন করে। গ্রন্থমেলা কোনোক্রমেই লাভ-লোকসান এবং কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার নয়। গ্রন্থমেলা পাঠক-ক্রেতার মানসিক বিকাশ এবং চিন্তার জগৎকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে।

ফেব্রুয়ারি ভাষার মাস। বইয়ের মাস। জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় ও বেশ কয়েকটি জেলায় বসেছিল বই মেলা। অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা মেলার শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রধান নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে।

২রা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শুরু হওয়া অমর একুশে গ্রন্থমেলায় মোট ৩৪টি প্যাভেলিয়ন ও কয়েকশত স্টল ছিল। মাসব্যাপী ব্যাপক উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মেলা শেষ হয়। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখে শুরু হয় একুশের গ্রন্থমেলা। চিত্তরঞ্জন সাহার ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে কলকাতা থেকে ৩২টি গ্রন্থ এনে এক টুকরো চটের ওপর বসে এই গ্রন্থমেলার গোড়াপত্তন করেন। আস্তে আস্তে একুশে গ্রন্থমেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বই কিনে কেউ কখনো দেউলিয়া হয় না। বলেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। ওমর খৈয়াম অবশ্য বলেছেন, ' রুটি-মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে। কিন্তু বই অনন্ত যৌবনা। যদি তা বইয়ের মতো বই হয়।' অমর একুশে গ্রন্থমেলা ঘিরে নির্ভুল ও মানসম্মত বই প্রকাশের চর্চা চলে আসছে। প্রকাশক, লেখক ও কবির মিলনস্থল এই বইমেলা। পুরাতন পাঠকদের সঙ্গে যোগ হয় নতুন প্রজন্মের বই পড়ুয়া পাঠকদের। এই পরিবেশ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, অনুপ্রেরণা যোগায়। যে-কোনো গ্রন্থমেলার কেন্দ্রবিন্দু হলো বই। নতুন, পুরাতন লেখক, কবি, প্রকাশক সবাই প্রাণের টানে উপস্থিত হয় এই গ্রন্থমেলায়। গ্রন্থমেলায় বই বিক্রি করাই শেষ কথা নয় বা মেলার সার্থকতা নয়।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০-এর সমাপনী অনুষ্ঠান মূলমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বাংলা একাডেমি পরিচালিত চারটি গুণীজন স্মৃতি পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। স্বাগত বক্তব্য দেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। গ্রন্থমেলার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০'-এর সদস্য-সচিব ড. জালাল আহমেদ।

২০১৯ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণগত মানসম্পন্ন সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'কথা প্রকাশ'কে চিত্তরঞ্জন স্মৃতি পুরস্কার, ২০১৯ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে শৈল্পিক ও গুণগত মান বিচারে সেরা গ্রন্থ বিভাগে আবুল হাসনাত রচিত 'প্রত্যয়ী স্মৃতি ও অন্যান্য' গ্রন্থের জন্য 'জার্নিম্যান বুকস', মঈনুস সুলতান রচিত 'জোহানেসবার্গের জার্নাল' গ্রন্থের জন্য 'প্রথমা প্রকাশন'কে এবং রফিকুন নবী রচিত 'স্মৃতির পথরেখা' গ্রন্থের জন্য বেঙ্গল পাবলিকেশন্সকে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হয়। ২০১৯ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণমানবিচারে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেডকে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং ২০২০ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিযান (এক ইউনিট), কুঁড়েঘর প্রকাশনী লিমিটেড (২-৪ ইউনিট) ও বাংলা প্রকাশ (প্যাভিলিয়ন) কে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হয়।

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের স্টল

অমর একুশের গ্রন্থমেলার বইয়ের ক্রেতা যেমন আছে তেমনি আছে দর্শকও। বইমেলায় বেড়ানো, সেলফি তুলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেওয়া, প্রিয় লেখকের সঙ্গে ছবি তোলা, প্রিয়জনকে বই উপহার দেওয়া চলে বইমেলায়। প্রকাশনা সংস্থাগুলোও তাদের বিনিয়োগের সিংহভাগ গ্রন্থমেলার বই প্রকাশের জন্য বরাদ্দ করে। সারা বছর কোনো রকমভাবে টিকে থাকা প্রকাশনা সংস্থাগুলো প্রাণ ফিরে পায় গ্রন্থমেলা এলে। মুদ্রণশিল্প, ডিজাইনিং, প্রুফরিডার, সম্পাদনা শাখার সব কর্মীদের মধ্যে বেড়ে যায় ব্যস্ততা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে জার্মান পুস্তকমেলা অন্যতম। কলকাতা পুস্তকমেলা এশিয়ার সেরা তেমনি বাংলাদেশের মধ্যে সেরা অমর একুশে গ্রন্থমেলা।

লেখক: প্রাবন্ধিক

স্বাধীনতা তুমি

শামসুর রাহমান

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা–
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা,
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল,
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁখাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত কথার ঝলসানি–লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখির দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক,
স্বাধীনতা তুমি
পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন,
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদির রং।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকির অমন তুলতুলে গালে রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

মহামূল্য স্বাধীনতা

হাসান হাফিজ

রক্তের উৎসব তুমি ছিলে একাত্তর।
দৃপ্ত ঐক্য তেজ ছিল মহীয়ান
আরো ছিল মৃত্যুঞ্জয়ী শপথের
ক্রোধ জেদ শত্রু হননের স্পর্ধা
মারণাস্ত্র মৃত্যুর ঝনঝনা।
সে তীব্র সময় ছিল
অহংকার এবং অগ্নির
সে মগ্ন অধ্যায় ছিল
স্বরূপের অন্বেষায়
নিজেকে চেনার
রক্তিম পতাকা পেতে
স্বয়ম্ভু ও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে
লক্ষ প্রাণ বলি দিতে হয়
স্বাধীনতা, কেন এই রক্তের পিপাসা
কেন এই উদ্‌গিরণ আগ্নেয় লাভার
যেন এই স্বাধীনতা চিরঞ্জীব শক্তপোক্ত হয়
সেজন্যেই এত বেশি রক্ত মূল্য
সেজন্যেই অনন্ত তৃষ্ণা ও ত্যাগ
সূর্যধর্মে জ্বলে জ্বলে ওঠা।

স্বাধীনতা আমার

রোকসানা গুলশান

স্বাধীনতা সেই উড়াল
যে ডানা আবর্তিত হয় নিজ ঘরে।
সিসিফাসের মতো চূড়ার আমন্ত্রণে
পাথর ঠেলে নেওয়া, বিজয়ের পথ।
পৃথিবীর প্রতি কোণে আছে
প্রেরণার মাটি,
মমতার বীজে করে লক্ষ্যজয়
দিন হোক নতুন জন্মের।
যুদ্ধ যেমন সত্য রক্ষার লড়াই,
মায়ের কোল যেমন প্রশান্তি আশ্রম,
স্বাধীনতা তেমন এক শিল্প
নিয়ন্ত্রণে বাঁচার।
অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, শেকলের বোঝা
মিথ্যের মতো অমানবিক।
যেতে পারো স্বাধীনতার আকাশে
ইচ্ছে যতদূর–
বাঁধো যদি মন শান্তি পতাকায়।
যে আত্মা চিনে নেয় ভেষজ আঘ্রাণ, চেষ্টায়।
যে চোখ খুঁজে ফেরে উষ্ণতা, সৌন্দর্যের।
সেই-ই বোঝে স্বাধীনতার সুখ
স্বাধীনতার বেদনা।
আত্মহননে নয়, আত্মশক্তিতেই মুক্তি–
স্বাধীনতা হোক শেষ কথা
এই জীবন ভালোবাসবার।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ সংগীত

খান আসাদুজ্জামান

আজ আমাদের জাতির পিতার
একশ বছর পূর্তিতে
আমরা সবাই মিলেছি আজ
আনন্দ আর ফুর্তিতে।
একশ বছর পূর্তিতে, আনন্দ আর ফুর্তিতে
একশ বছর পূর্তিতে, আনন্দ আর ফুর্তিতে।
শোককে আজি শক্তি করি
সবার হাতে হাতটি ধরি
জাতির পিতার স্বপ্ন বেয়ে
সোনার বাংলার কোরাশ গেয়ে
এগিয়ে যাবো স্বস্তিতে।
একশ বছর পূর্তিতে, আনন্দ আর ফুর্তিতে
একশ বছর পূর্তিতে, আনন্দ আর ফুর্তিতে।
মোরা, কোটি কোটি বাঙালি আজ
দেহ-মনে বীরের-ই সাজ
আমরা, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছোঁবো
সবাই মোরা যোদ্ধা হবো
বাঙালিত্বের ভিত্তিতে।
একশ বছর পূর্তিতে, আনন্দ আর ফুর্তিতে
একশ বছর পূর্তিতে, আনন্দ আর ফুর্তিতে।

মহাকালের শ্রেষ্ঠ ভাষণ

মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ

এই সেই রেসকোর্স ময়দান! যার বুকে মিশে গিয়েছিল
স্বাধীনতার স্থপতি ও মহাসংগ্রামের বাহক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
সাতই মার্চের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাষণ
বজ্রকণ্ঠে মুখরিত হয়েছিল– দেশ-জাতি সব মানুষের ভেতর।
শুধু উপস্থিত আপামর জনতা নয়
কেঁপে উঠেছিল চারপাশ বেষ্টিত
কাঠের দেয়াল ও সারি বাঁধা রেসের ঘোড়া।
মাঠের দূর্বাঘাস আকাশছোঁয়া গাছগাছালি
সহস্র সহস্র পাতাবাহার
উজ্জীবিত হয়ে প্রণাম জানায়, অকুতোভয় সেই ভাষণকে।
সেদিনের বয়ে যাওয়া দখিনা বাতাস
রমনা পার্কের অজস্র দণ্ডায়মান গাছের সারি
পাখির কিচিরমিচির কোকিলের কুহুতান
লেকের পানির উত্থাল-পাতাল
সেদিন বেড়ে গিয়েছিল অনাবিল আনন্দ-উল্লাসে।
বঙ্গবন্ধুর বিচ্ছুরিত মহাকালের ভাষণ
আমি দেখেছি– শুনেছিও বটে অবিসংবাদিত ভাষণ
যার মূর্ছনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলি
কালের স্রোতে মিশে বিদিশার মহা কলতানে।
আমি বহুকাল এ ময়দানের মাঝখান দিয়ে
হেঁটে গিয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন।
পড়ার ছলে– সেখানে আনমনে শুনেছি বারংবার
বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার জয়গান।

মুক্তির অবতার

সাঈদ তপু

দুঃখ-ভারাক্রান্ত বিকেল
শিকল পরা পায়ে অপেক্ষমান
কখন করবে অবতরণ, মুক্তির অবতার?
উত্তাল সমুদ্রের মতোন
উজানে সাঁতার কাটা জনতার স্রোত
সময়ের ক্রোধে চৌচির
কালের ডায়েরিতে লেখা হবে ইতিহাস
কাঁটার বিপরীতে ফুলের সুবাস
কখন আসবে সেই ফুলের অবতার?
উৎকণ্ঠায় লাল হলো কৃষ্ণচূড়ার ডাল
উদ্যানের পত্র-পল্লব,কিশোরীর চোখ
বিপ্লবীর চোখের মতোন
অতঃপর এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ
একদফা, এক দাবি
শোনালেন তাঁর অমিয় অমরবাণী
এবারের সংগ্রাম,আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম
এভাবেই মুক্ত হলো– কাঁটা থেকে ফুল
পাখির ডানায়– যুক্ত হলো বিকেল
নেমে গেল কাঁধের সমস্ত ভার
যখন নেমে এল সবুজ গালিচায়
বাংলা ও বাঙালির মুক্তির অবতার।

স্বাধীনতার সুফল

সাঈদ হোসেন

স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই
পেয়েছি মোরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা।
স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই
আজ অর্থনীতিতে আমরা
সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।
স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই
গণতন্ত্র সূচকে এগিয়েছি
বিশ্বে মোরা আট ধাপ।
স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই
আজ আর কেউ বলতে পারে না
আমরা তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ।
স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই
আজ হচ্ছে নিজ অর্থায়নে
পদ্মা সেতুর মতো দীর্ঘ সেতু।
স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই
আজ আমরা বিচার করতে পেরেছি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের।
স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই
স্বাধীন দেশে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছি।

পদ্যরা যেভাবে এল

আলী মামুদ

আমার জীবনে পদ্য এল
স্কুল মাঠের সবুজ ঘাস থেকে
সারি সারি পিঁপড়ার মতো উঠে এল তারা,
তারা এসে বলল, চল আমাদের সাথে
আমি তাদের কথায় অমত করতে পারলাম না
বললাম চল তাহলে যাই
সেই থেকে পদ্যদের সাথে
আমার সখ্যতা, পদ্যের সঙ্গে এই বসবাস।
নানা ঘাট পার হয়ে দীর্ঘদিন পর
আবার তারা এখন বলছে, চল যাই
সেই স্কুলের সবুজ মাঠে গিয়ে
জড় হই, পদাবলি রচনা করি নতুন আঙ্গিকে।

সোনার বাংলা

রুস্তম আলী

স্বাধীনতা তুমি আমার হৃদয়ের গহীনে ফুটন্ত গোলাপ
স্বাধীনতা তুমি শত বছরের সুশোভিত সাজানো বাগান
স্বাধীনতা তোমার বুকে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান।
স্বাধীনতা তুমি শত কোটি বাঙালির বুকে
বয়ে যাওয়া দাবানল।
স্বাধীনতা তুমি ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত
লাল-সবুজের পতাকা।
স্বাধীনতা তুমি রেসকোর্স ময়দানে আঙুলি
তুলে যুদ্ধের নির্দেশনা।
স্বাধীনতা তুমি একাত্তরের বঙ্গবন্ধুর বজ্র ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি জাতির পিতার স্বপ্নের
সোনার বাংলা।

শতবর্ষে তোমায় দেখি

সেঁজুতি রহমান

সার্থক জনম তোমার
হে পিতা, আজ শতবর্ষ পরে
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বেঁচে আছ বাংলার প্রতিটি ঘরে।
শৌর্য-বীর্যে চির ভাস্কর, চির অম্লান
তুমি জেগে আছ সকলের অন্তরে,
তোমার বজ্রকণ্ঠের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়
গ্রামেগঞ্জে, শহরে-প্রান্তরে।
তোমার স্মৃতি বিজয় নিশানে
স্বাধীন ভূখণ্ডে, মুক্তির ডোরে,
হৃদয়ের পরতে পরতে
বেঁচে থাকবে যুগ থেকে যুগান্তরে।
মুজিব মানেই বাংলাদেশ
অগণিত বাঙালির নিখাদ ভালোবাসা,
মুজিব মানেই স্বাধীনতার ডাক
কোটি বাঙালির স্বপ্ন ও আশা।
তোমার অসীম সাহস, সৌহার্দ্য
কোমল হৃদয়, মৈত্রীর বন্ধন
ভুলবে না কোনোদিন বাংলার
আপামর জনসাধারণ।
জ্বলজ্বল করছে তোমার নাম
বাংলার ইতিহাসে, তুমি অমূল্য সম্পদ
বাংলা ও বাঙালির,
তোমার জন্ম-মৃত্যুর রয়েছে ইতিহাস
তুমি মহান বীর।
সার্থক হয়েছে স্বপ্ন তোমার
তুমি যুগস্রষ্টা, মহানায়ক, রাজনীতির কবি
তুমি বাঙালির শক্তি অনুপ্রেরণা,
মহান নেতা, তুমি বাংলার ছবি।
আজ ঐতিহাসিক ১৭ই মার্চ
তোমার শুভ জন্মদিন,
লক্ষ বুলেটও অমলিন হবে না স্মৃতি
শোধ হবে না এ রক্তের ঋণ।

মুজিববর্ষ

আবিদ হোসেন

মুজিববর্ষ মানে
বাঙালির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধুর
জন্মশতবর্ষ গৌরব ও অহংকারের বার্তা
মুজিববর্ষ মানে
আনন্দ হর্ষের এক মাহেন্দ্রক্ষণ
মুজিববর্ষ মানে
বাংলাদেশের স্থপতির স্মরণের কালজয়ী বছর
মুজিববর্ষ মানে
এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়।

সেই খোকাটি

গোবিন্দলাল সরকার

টুঙ্গিপাড়ার সেই ছেলেটি
নামটি কি তাঁর জানো?
শেখ মুজিবুর রহমান
তাঁর ঋণ কি যায় শোধরানো?
চলায়-বলায় সবখানেতে
সেই ছিল ডানপিটে
সবচেয়ে তাঁর প্রিয় সে তো
এ জয় বাংলার ভিটে।
বুক ভরা তাঁর স্বপ্ন ছিল
বাংলা-মায়ের জন্য
স্বাধীনতা আসলে পরে
দেশটা হবে ধন্য।
এই আশাতে বুক বেঁধে যে
হলেন দৃঢ়চেতা
সেই খোকাটি বঙ্গবন্ধু
জাতির মহান নেতা।
সেই ছেলেটি সেই খোকাটি
শেখ মুজিবুর রহমান
পণ করে সে-ই নিয়ে এল
এই স্বাধীনতার মান।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ

ইভা রহমান

'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'। নারী একাধারে কন্যা, জায়া, জননী। নারীদের ক্ষমতায়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায়– যার মাধ্যমে নারীরা তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে বের হয়ে নিজেদের যোগ্যতা ও অর্জনকে তুলে ধরতে পারেন। পাশাপাশি পরিবার, সমাজ এবং গণজীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সিদ্ধান্ত ও অবস্থানকে তুলে ধরতে পারেন।

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বীরকন্যা প্রীতিলতা, তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তি নেত্রী ইলা মিত্রের মতো ত্যাগী ও সাহসী নারীদের অনুসরণ করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন বাংলাদেশের নারীরা। বীর প্রতীক সেতারা বেগম, তারামন বিবি, কাকন বিবি, বিথিকা বিশ্বাস, শিশির কনা, আলেয়া বেগম, আলমতাজ বেগম, মেহেরুন্নেছা, হালিমা খাতুন, আছিয়া বেগমের মতো হাজার হাজার নারী মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন আমাদের। নারী ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই প্রথম নারীদের মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন ১৯৬৭ সালে মহিলা লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে সংবিধানে রাষ্ট্র ও জনজীবনের সব পর্যায়ে নারীদের সমঅধিকার দেওয়া এবং নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মান উন্নয়নে রাষ্ট্রের বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা সংযোজন করা হয় (অনুচ্ছেদ ২৭ ও ২৮)। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা কর্তৃক নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শুরু করা হয় যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক অভিযাত্রা। তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের নারী ও শিশু অধিকার এবং উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ইতোমধ্যে বিবিধ পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশনসহ সকল আন্তর্জাতিক সনদ অনুসরণ করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ততাকে বাড়ানোর জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) বিভিন্ন বিষয় যুক্ত করা হয়েছে।

বিশ্বায়নের এ যুগে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান। নারীরা আজ সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে নিজেকে স্বাবলম্বী করতে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছে। পারিবারিক বিধিনিষেধ ও পুরুষতান্ত্রিক বেড়াজাল ভেদ করে অধিকার আদায়ে অনেক বেশি সোচ্চার বর্তমান নারীরা। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম পর্যায় ছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে ঘিরে। মূলত দারিদ্র্য দূরীকরণের নিমিত্তেই নারীরা অর্থনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে। আশির দশকে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীরা উপার্জনের পথ খুঁজে পায়। পরবর্তীতে অন্যান্য এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এই ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ৯৭ শতাংশের অধিকই নারী। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূর করে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ সব দেশকে পেছনে ফেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এটি কেবলমাত্র সম্ভব হয়েছে অর্থনীতিতে নারীদের সম্পৃক্ততার ফলে।

অর্থনৈতিক খাতে নারীদের সম্পৃক্ত করতে কোনো জামানত ছাড়াই এসএমই ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ ব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিতে পারছেন। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও কর্মের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় নারীদের কর্মস্পৃহা বেড়ে গেছে বহুগুণ। কৃষি, শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কাজ করছে দক্ষতার সাথে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সেনা, নৌ, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, সাহিত্য, শিল্পসহ সর্বোচ্চ বিচারিক কার্যে নারীদের অংশগ্রহণ ও সাফল্য লক্ষণীয়।

প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নিজ যোগ্যতায় নিজেদের জায়গা তৈরি করে নিচ্ছেন নারীরা। সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব এমনকি সহকারী সচিব পদেও নারীরা

দক্ষতার সাথে কাজ করে চলেছেন। জেলা প্রশাসক, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমার প্রধান নির্বাহী থেকে শুরু করে সকল স্তরে, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, নিরাপত্তা বাহিনী, সংবাদকর্মী, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, খেলাধুলা– সকল ক্ষেত্রে সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন বাংলাদেশের নারীরা।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ ২০১৯-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশ এখন ৪২তম বড়ো রপ্তানিকারক দেশ। আর এই রপ্তানিতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার অগ্রভাগে রয়েছে পোশাক খাত। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ মোট ৪ হাজার ৫৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। এর মধ্যে পোশাক খাতের অবদান ৮৪ শতাংশ। বাংলাদেশের এই বিশাল সাফল্যের পেছনে নারীদের অবদান সবচেয়ে বেশি, কারণ তৈরি পোশাক খাতে প্রায় ৮৫ শতাংশ নারী কাজ করছেন।

নারী সমাজকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ প্রশংসনীয়। নারী নীতি, ডমেস্টিক ভায়োলেন্স আইন, নারী উন্নয়ন বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা, ডিএনএ আইনসহ অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ২ কোটি নারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। বেইজিং ডিক্লারেশন ও সিডো সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ভূমিকা বহির্বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা নির্ধারণে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– নারীর সামর্থ্য উন্নীতকরণ, নারীর অর্থনৈতিক প্রাপ্তি বৃদ্ধিকরণ, নারীর মতপ্রকাশ ও মত প্রকাশের মাধ্যম সম্প্রসারণ এবং নারী উন্নয়নে পরিবেশ সৃষ্টিকরণ। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকার বিনামূল্যে ৬-১০ বছর বয়সি সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের বিনামূল্যে পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে এবং স্কুলে যেতে উৎসাহিত করতে মেয়েদের দেওয়া হচ্ছে বৃত্তি। দুস্থ, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য সরকার বহুমুখী প্রকল্প চালু করেছে। যেমন– ভিজিএফ, ভিজিডি, দুস্থ ভাতা, মাতৃত্বকালীন ও গর্ভবতী মায়েদের ভাতা, অক্ষম মা ও তালাকপ্রাপ্তদের জন্য ভাতা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, আমার বাড়ি আমার খামার ইত্যাদি। কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে সহজ করার লক্ষ্যে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। প্রান্তিক নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমের আওতায় গর্ভধারণ থেকে প্রসবকালীন সব খরচ, এমনকি যাতায়াত খরচও এখন সরকার বহন করছে। যার ফলে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার অনেক কমে গিয়েছে।

নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন ২০১২। নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রণয়ন করা হয়েছে মানবপাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১। বাল্যবিবাহ নিরোধে বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ২০১৭, মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তায় শিশু আইন ২০১৩, হিন্দু নারীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার্থে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে এবং ৭টি বিভাগে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও ১০৯ হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে।

নারী-পুরুষের সমতা অনুধাবনের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারী-পুরুষের আনুপাতিক অবস্থান। বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ন বা নেতৃত্বের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ২০ বছরেরও অধিক সময় ধরে দেশের ক্ষমতার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত আছেন দুই নারী। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন নারী। জাতীয় সংসদের ইতিহাসে প্রথম নারী স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ছাড়াও নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও জয়ী হয়েছেন বিপুল সংখ্যক নারী। দেশের প্রথম নারী মেয়র হিসেবে ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন ডা. সেলিনা হায়াত আইভী। স্থানীয় প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান, মেম্বার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেছেন নারীরা। বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় পরপর কয়েকবার স্থান অর্জন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে তাঁর এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ, প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন, এজেন্ট অব চেঞ্জসহ নানাবিধ সম্মাননা অর্জন করেছেন। প্রথম নারী উপাচার্য, প্রথম নারী পর্বতারোহী, প্রথম বিজিএমইএ নারী সভাপতি, প্রথম সংখ্যালঘু নারী মেজর, প্রথম নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সৃষ্টি হয়েছে বিগত এক দশকেই। নারীদের এই অভূতপূর্ব ক্ষমতায়নে যার ভূমিকা সবার আগে তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

লেখক: প্রাবন্ধিক

মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ ঘোষণা

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজারদেরকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগ সেবা বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা বেশি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং দক্ষ জনসম্পদ গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)-এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সবিহ উদ্দিন হলে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আরইবির জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নসরুল হামিদ বলেন, জুন ২০২০-এর মধ্যে গ্রিড এলাকায় এবং ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে অফগ্রিড এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে। এসব উদ্যোগের সাথে আরইবির জেনারেল ম্যানেজারদের সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের সর্বোচ্চ অবদান রাখতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গ্রাহকরা এখন মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ চায়। ট্রিপ বা শাট ডাউন শুনতে চায় না। আরইবির গ্রাহকরা গড়ে ৯৮ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, যা দ্রুততার সাথে ১০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)-এর চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অব.) ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদন: আনিকা তাবাস্‌সুম

বই মানুষের পরম বন্ধু

শিউলি শারমিন আহমেদ

বই মানুষের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু এবং চলার পথের শ্রেষ্ঠতম সাথি। যুগযুগান্তর থেকে বইপ্রিয় মানুষেরা বইয়ের মধ্যে শুধু জ্ঞান নয়, মুক্তিরও সন্ধান করেন। কেননা, সভ্যতার অতীত-বর্তমান জ্ঞানের চোখ দিয়ে দেখতে হয়। আর তার একমাত্র অবলম্বন হলো বই। আর এর জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন: বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেওয়া সাঁকো।

'বই' শব্দটির উৎস হচ্ছে 'বহি'। 'বহি' শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ 'ওহি' থেকে। এর নামটিতেই রয়েছে অলৌকিকের উদ্ভাস। কারণ বই আমাদের নিয়ে যায়– চেনা পৃথিবীর বাইরে, অজানা রোমাঞ্চের ভুবনে।

বই হচ্ছে জ্ঞান ও বিনোদন উপস্থাপনের মুদ্রিত ও বাঁধাইকৃত মাধ্যম। বই বলতে বোঝায়– লেখা, ছাপানো অক্ষর, ছবি বিশিষ্ট কাগজ বা অন্য কোনো মাধ্যমের তৈরি পাতলা শিট বা ডিজিটাল পৃষ্ঠার সমষ্টিকে, যা একাধারে বাঁধা থাকে এবং মলাটের ভেতরে রক্ষিত থাকে। বইয়ের সমার্থক শব্দ হচ্ছে গ্রন্থ, কিতাব, পুস্তক ইত্যাদি।

পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে সভ্যতাও। সেই সাথে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে বইয়েও। যার ডিজিটাল ধরন হচ্ছে ই-বুক, যা কম্পিউটার, মোবাইল,ট্যাবলেট কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করে পড়তে হয়।

বই জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম। বই এমন একটি উপকরণ, যা একজন মানুষকে সহজেই আলোকিত করে তুলতে পারে। শিক্ষার আলো, নীতি-নৈতিকতা-আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সব কিছুই রয়েছে বইয়ের ভেতরে।

সবধরনের জ্ঞানের মজুত রয়েছে বইয়ের মধ্যে। প্রত্যেকের জীবনেই একঘেয়েমি, দুঃখ-কষ্ট, অস্থিরতা, মানসিক সমস্যাসহ নানা সমস্যা থাকে। কিন্তু বই পড়লে সেসব চিন্তা মাথায় থাকে না। অবসর সময়গুলো বিনোদনের মাধ্যমে কাটানোর জন্য কত কিছুই না আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীতে, কিন্তু বই পড়ার মতো নির্মল আনন্দের সমতুল্য কিছুই হতে পারে না।

জ্ঞানচর্চা মানুষকে যেমন করে তোলে উদার, তেমনি চিত্তকে দেয় মুক্তি। মানবাত্মাকে জীবনবোধে বিকশিত করে। জাগ্রত করে তোলে মনুষ্যত্ববোধ। সব বিষয়ে সুশৃঙ্খল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জন এবং পরিপূর্ণ মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে হলে অবশ্যই বই পড়তে হবে। এজন্য মনোযোগের সাথে বই পড়া দরকার।

একটি সুস্থ, সুন্দর জাতি গঠন করতে হলে অবশ্যই বই পড়তে হবে। বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ বই মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। বড়ো মনের মানুষ হওয়ার জন্য বইয়ের সান্নিধ্যে আসতেই হবে। একজন লেখক তার সুপ্ত ভাবনাকে লেখনির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। কবি-সাহিত্যিক-লেখকেরা তাদের সমস্ত জ্ঞান বইয়ের পাতায় ঢেলে দেন। বই পড়ে সেই জ্ঞানের আলো সংগ্রহ করা যায়। বই পড়া মানুষের কাছেই দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপদ থাকবে। যারা বড়ো হতে চায়; তাদের প্রয়োজন বেশি বেশি করে বই পড়া। বই পড়লে মানুষ হয়ে ওঠে কর্মদ্যম; সহনশীল ও সহমর্মী। মানুষ বই পড়েই নিজেকে জানতে পারে এবং নিজের জীবনকে আলোকিত করে তুলতে পারে। একটি ভালো বই যে-কোনো মানুষকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিতে পারে। কারণ যাদের জ্ঞানের পরিসর কম তারাই কুকর্মের সাথে বেশি জড়িত হয়ে পড়ে।

তাই নতুন প্রজন্মকে বেশি বেশি বই পাঠে উৎসাহিত করতে হবে। কারণ তারা যত জ্ঞানার্জন করবে, ভবিষ্যতের উন্নত জাতি ও রাষ্ট্র

গঠনে তারা তত ভূমিকা রাখতে পারবে। দিন বদলের সাথে সাথে বইয়ের গায়েও প্রযুক্তির যে ছোঁয়া লেগেছে কিন্তু তাতে বই পড়ার আগ্রহ কমে যায়নি বরং বেড়েছে। কারণ সেটা বইয়ের পাতায়ই হোক অ্যান্ড্রয়েড ফোনের টাচে যে-কোনো ফরম্যাটে বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সকল বয়সি মানুষের বেড়েই চলেছে। আর অবাক হলেও সত্য যে, বই পড়ায় তরুণেরাই এগিয়ে। তরুণদের আগ্রহই হলো আগামী দিনের বইয়ের ভরসা। তাই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'জয়,তরুণের জয়।'

আগামী সময়টা হবে জ্ঞানভিত্তিক। উদ্ভাবনী জ্ঞান ছাড়া সেই তরঙ্গসংকুল পথে এগুনোর কোনো পথ নেই। অনিশ্চয়তার সেই অপর সমুদ্রে বই-ই আলোকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর। তাই আসুন আমরা বইকে ভালোবাসি, বই পড়ি এবং সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ি।

লেখক: প্রাবন্ধিক

শিগগিরই আসছে ডাক টাকা

ডিজিটাল আর্থিক সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মাধ্যমে নগদ লেনদেনকে ডিজিটাল লেনদেন রূপান্তর এবং ডিজিটাল সেবার পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর এবং ডাক টাকা বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের উপস্থিতিতে আজ বাংলাদেশ সচিবালয় মন্ত্রীর দপ্তরে এ স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এতে ডাক অধিদপ্তরের পক্ষে অধিদপ্তরেরর মহাপরিচালক এসএস ভদ্র এবং ডি মানি বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের ভাইস চেয়ারম্যান সোনিয়া বশীর কবির স্বাক্ষর করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মোঃ নুর-উর-রহমান এবং ডাক টাকা বাংলাদেশ লিমিটেড ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরেফ বশীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

নিরাপদ, শক্তিশালী পেমেন্ট সার্ভিস প্লাটফর্মের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের জন্য ডিজিটাল আর্থিক পরিবেশ গড়ে তোলাই ডাক টাকার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া ডাক টাকার মাধ্যমে ডাক অধিদপ্তরের আর্থিক সেবাসমূহ ডিজিটালাইজেশন, ডিজিটাল কমার্স পেমেন্টে, যাবতীয় ইউটিলিটি বিল, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতাসমূহ, সকল প্রকার বৃত্তি-উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ, যাবতীয় ঋণ, অনুদান ও যাবতীয় চার্জ বিবিধ চালান জমা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিশোধ করা যাবে। এই উদ্যোগের ফলে ডাক বিভাগের ডিজিটাল রূপান্তর আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ তাঁর কার্যালয়ে 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক

সুষমা ফাল্গুনী

সেরা শিক্ষার্থীরা পেলেন 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৮'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে ফেব্রুয়ারি তাঁর কার্যালয়ের শাপলা হলে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৩৬টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭২ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৮' প্রদান করেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর কমিশনের (ইউজিসি) উদ্যোগে দেশের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। এ বছর দেশের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর বা সিজিপিএ অর্জনকারী ১৭২ শিক্ষার্থীকে (৮৮ জন ছাত্রী ও ৮৪ জন ছাত্র) 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' দেওয়া হয়েছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর কাজী শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এবং ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং সচিববৃন্দ, জাতীয় অধ্যাপক, সাবেক ইউজিসি চেয়ারম্যানগণ, বর্তমান এবং সাবেক ইউজিসি সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রো উপাচার্য এবং শিক্ষাবিদগণ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ টেকনোলজি'র শিক্ষার্থী মো. মোবারক হোসেন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজের শারমিন সুলতানা অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিজয়ীদের পক্ষে নিজস্ব অনভূতি ব্যক্ত করেন।

স্বর্ণপদক প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা শিক্ষা ও গবেষণার ওপর সর্বত্র গুরুত্ব দিয়েছি। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। তিনি বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ব স্ব বিভাগে আজ যারা পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণপদক পেলে তারা ২০৪১ সালের বাংলাদেশ গড়ার কারিগর।'

স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'শিক্ষার মান উন্নয়নে আরও কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়– সে বিষয়ে তোমরা সুপারিশ করবে। শিক্ষার মানোন্নয়নে যা যা করা প্রয়োজন আমরা তাই করব। আমরা প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় করে সারা দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাই। আটটি বিভাগে আমরা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এছাড়া জেলা পর্যায়েও আমরা বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে চাই।'

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে ১৬৩ জন শিক্ষার্থীকে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। দেশের বিশ্ববিদ্যালসমূহের কৃতী শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও অধ্যয়নে উৎসাহ প্রদানের জন্য ইউজিসি ২০০৫ সালে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক প্রবর্তন করে।

লেখক: শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধুর থানা পরিদর্শনের নোট ও স্বাক্ষর সংগ্রহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন হবে বছরজুড়ে। ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে শুরু হবে এ কর্মসূচি পালন ও উদ্‌যাপন। পুরো এ বছরটির নামকরণ করা হয়েছে– মুজিববর্ষ। এ বছরের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস থেকে শুরু হয়েছে মুজিববর্ষের আনুষ্ঠানিক কাউন্টডাউন। এ উপলক্ষে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতো মুজিববর্ষ পালনে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর জীবন ছিল কারাগারের জীবন। পুরো রাজনৈতিক জীবনে তিনি অসংখ্যবার কারাগারে কাটিয়েছেন। পুলিশের হাতে বন্দি হয়ে বারবার থানায় যেতে হয়েছে তাঁকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার প্রধান হিসেবে বিভিন্ন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি পরিদর্শন করেছেন। বঙ্গবন্ধু পরিদর্শনে গেছেন এমন থানাগুলো থেকে তাঁর পরিদর্শনের নোট ও স্বাক্ষর সংগ্রহ করবে পুলিশবাহিনী।

জাতির পিতার সাহচর্য পেয়েছেন এমন পুলিশ সদস্যের সাক্ষাৎকার নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করা হবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের সীমান্তরক্ষায় নিয়োজিত বিজিবিও নিচ্ছে বিশেষ কর্মসূচি। বিভিন্ন সীমান্তে পরিত্যক্ত বিওপিগুলোতে খোলা হবে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিকেতন। সেখানে বয়স্কদের জন্য নৈশ ও শিশুদের জন্য প্রভাতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রতিবেদন: রিফাত হোসেন

সরকার ও জনগণের বন্ধন যত বেশি মজবুত হবে গণতন্ত্র তত টেকসই হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা হচ্ছেন সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন। তাই এই বন্ধন যত বেশি মজবুত ও দৃঢ় হবে, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের বিকাশও তত বেশি টেকসই হবে। চলমান অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের বিকাশ টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন বজায় রাখতে হবে বলে সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং সংসদ সদস্যদের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, আপনারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনগণ অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনাদেরকে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তাই আপনাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। বাংলাদেশের জনগণের চাওয়া-পাওয়া খুবই সীমিত। অল্পতেই তারা খুশি হন। নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা থাকে প্রয়োজনের সময় তারা যেন তাকে কাছে পায়। তাই আপনারা নির্বাচনি এলাকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন এবং জনগণের প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে দাঁড়াবেন। এতে দল ও সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক ও যোগাযোগ মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে ডামি মোবাইল ফোনের বোতাম চেপে 'বেসিস সফটএক্সপো ২০২০'-এর উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

সুকুমার বৃত্তির বিকাশে শিল্প-সাহিত্যচর্চা গুরুত্বপূর্ণ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধ এবং সুকুমার বৃত্তির বিকাশে শিল্প-সাহিত্যচর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নবতর চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের মাধ্যমেই নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব। ২রা ফেব্রুয়ারি 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন।

বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলা একাডেমি কর্তৃক এবারের একুশে গ্রন্থমেলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক ১০০টি বই প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করি লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও সাহিত্যপ্রেমীদের অংশগ্রহণে গ্রন্থমেলা বরাবরের মতো মহামিলন মেলায় পরিণত হবে। এছাড়া বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সৃজনশীল ও মননশীল লেখকদের বিকাশ ও অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে অমর একুশে গ্রন্থমেলা এক অবিকল্প আয়োজন। মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সমুজ্জ্বল রেখে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে উঠবে।

তথ্যপ্রযুক্তিতে তরুণ সমাজকে কাজে লাগানোর আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বেসিস সফটএক্সপো- ২০২০ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব এখন এগিয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তাল মেলাতে আমাদের তরুণ সমাজকে কাজে লাগাতে হবে। ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ 'ট্রান্সফর্মিং লাইফ থ্রু ইনোভেশন'– স্লোগানে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) চার দিনব্যাপী ১৬তম বেসিস সফটএক্সপো- ২০২০ উদ্‌বোধনকালে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করছে। আমাদের তরুণ সমাজকে কাজে লাগাতে হবে। কারণ তারাই আমাদের সম্পদ। আমাদের মেধাবী তরুণরা বাইরে কাজ করছে, যথাযথ সুযোগ তৈরি করতে পারলে এরা দেশেই কাজ করতে পারবে। এছাড়া রাষ্ট্রপতি বলেন, স্থানীয় সফটওয়্যার অর্থাৎ মেইড ইন বাংলাদেশ ধারণাকে উৎসাহিত করতে হবে। সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে দাতা সংস্থার সহায়তার বাস্তবায়িত প্রকল্পে স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোকে সুযোগ দিতে হবে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সাহিত্য আরো অনুবাদ হোক। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ আমাদের সাহিত্যকে জানুক, আমাদের সংস্কৃতিকে জানুক, সেটাই আমরা চাই। ২০১৯ সালের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরুস্কার দশ কবি ও সাহিত্যকের কাছে হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রচিত তৃতীয় বই 'আমার দেখা নয়া চীন এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) স্টলে গ্রাফিক নভেল 'মুজিব সপ্তম খণ্ডের মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ মিরপুর সেনানিবাসে ডিএসসিএসসি ২০১৯-২০২০ কোর্সের Graduation Ceremony-তে বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রীর ইতালি সফর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ইতালির স্থানীয় সময় বিকাল সোয়া ৪টায় রোমে পৌঁছেন। প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান মিনিস্টার পেনিপোটেনসিয়ারি অব ইটালিয়ান ফরেন মিনিস্ট্রি ক্রিস্টিয়ানো কোস্তাফাবি এবং ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবদুস সোবহান সিকদার। বিমানবন্দর থেকে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে পার্কো দেই দেই প্রিন্সিপি গ্রান্ড হোটেল অ্যান্ড স্পায় নিয়ে যাওয়া হয়। সফরকালে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। এদিন রাতে প্রধানমন্ত্রী নাগরিক সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেন। সফরকালে তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবন পালাজো চিগিতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং স্থায়ী প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে ইতালিসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন দেশগুলোর অব্যাহত সমর্থন চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দুই প্রধানমন্ত্রী উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং দুই দেশের মধ্যকার বর্তমান অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বৈঠক শেষে ঢাকা-রোম ৯ দফা যৌথ ঘোষণা হয়। প্রধানমন্ত্রী ভ্যাটিকান সিটিতে ক্যাথোলিক খ্রিষ্টানদের আধ্যাত্মিক নেতা পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি রোমের ভিয়া দেল আন্তারতিদে এলাকায় বাংলাদেশ দূতাবাসের চ্যান্সেরি ভবন উদ্‌বোধন করেন। এছাড়া ইতালির ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে ৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি দেশে ফেরেন।

গ্র্যাজুয়েটদের নতুন দায়িত্বে মনোযোগী হয়ে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই ফেব্রুয়ারি মিরপুর সেনানিবাসে কমান্ড্যান্ট সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কোর্সের সমাপন ও গ্রাজুয়েশন সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্রবাহিনীর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের প্রশংসা করেন। তিনি সব গ্রাজুয়েটদের সাফল্যেও সঙ্গে কোর্স সম্পন্ন করার জন্য অভিনন্দন জানান এবং তাদের সবাইকে নতুন দায়িত্বে মনোযোগ হয়ে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য উপদেশ দেন। পরে তিনি কোর্স সম্পন্নকারী অফিসারদের মাঝে গ্র্যাজুয়েশন সনদপত্র বিতরণ করেন।

উদ্যোক্তা হওয়ার আহবান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ৬ষ্ঠ উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুবসমাজকে চাকরি করার চাইতে চাকরি দেওয়ার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তিনি যুবসমাজকে দক্ষ এবং যোগ্যতা সম্পন্ন করে তোলার লক্ষ্যে ট্রাস্টের কাছ থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আরো বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হবে বলে উল্লেখ করেন। যাতে করে তারা চাকরির পেছনে না গিয়ে উদ্যোক্ত হতে পারে।

একনেকে ৯ প্রকল্পের অনুমোদন এবং সব জেলায় কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই ফেব্রুয়ারি শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রামের কিডনি রোগীদের জেলা শহরেই উন্নত চিকিৎসা দিতে সব জেলায় কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্য ধরা হয়েছে। এই প্রকল্পসহ সভায় ৯টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়া গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও ফাইব-জি সেবা দিতে নেটওয়ার্কের আধুনিকায়নের জন্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

উন্নত জাতি গঠনে একাত্ম হওয়ার আহ্বান

উন্নত দেশ গঠনের পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠনে সবাইকে একসাথে কাজ করার জন্য আবারো উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাজধানীর জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে 'নিটল-আয়াত-নিউজ নাউ বাংলা' এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান তিনি। তথ্যমন্ত্রী বলেন, অন্যদের অন্ধ অনুকরণ নয়, উন্নত জাতি গড়ে সরকার এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে চায়, যাতে ভবিষ্যতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে অনুকরণ করে। আর এজন্য সবাইকে একাত্ম হতে হবে। এ সময় তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, যে পাকিস্তান বাংলাদেশকে অবজ্ঞা করত তারা আজ বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে আক্ষেপ করে। আগামী দুবছরের মধ্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ভারতকে ছাড়িয়ে যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় শহিদ আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিকতায় রোজিনা ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রিপোর্টিংয়ে ফারজানা আফরিন, বাণিজ্যে প্রবীর কুমার সাহা, সংস্কৃতিতে মেহের আফরোজ শাওন, পর্যটনে শাহ মোমিনকে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতায় সংগঠন হিসাবে আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ উপ কমিটির প্রতিনিধির হাতে সম্মাননা তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী।

সুশৃঙ্খল গণমাধ্যম গড়তে প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা

উন্নত জাতি গঠন ও সমাজে বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য গণমাধ্যমে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সকলকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ। ১৪ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর তোপখানা রোডে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ পরিবেশনের প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, অনেক অসত্য ও ভুল সংবাদ পরিবেশিত হয়, যেগুলো অনেক সময় মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ, রাষ্ট্রের জন্য হুমকি ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ। এ বিষয়ে প্রেস কাউন্সিলের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন গণমাধ্যমের সকলের সহযোগিতা। তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ন্যায়ভিত্তিক ও বিতর্কভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন থাকতে হবে, তেমনি সে স্বাধীনতা যেন অন্যের স্বাধীনতা কিংবা অধিকারে অযাচিত হস্তক্ষেপ না হয় সেদিকেও গণমাধ্যম কর্মীদের লক্ষ রাখতে হবে। কারণ সমাজে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেমন আবশ্যকীয়, তেমনি অন্যের মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষার নিশ্চয়তার বিধানও সমাজে থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে গত এগারো বছরে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, বেতার, অনলাইন গণমাধ্যমের যুগান্তকারী বিকাশ ও সজীবতার কথা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, গত এগারো বছরে গণমাধ্যমের ক্যানভাসটাই অনেক প্রসারিত হয়েছে। একই সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যে কোনো গণমাধ্যম নয়, এটি শুধু মত প্রকাশের অসম্পাদিত ক্ষেত্র, তা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। এ সময় তথ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৭৪ সালে সদ্য স্বাধীন দেশে প্রেস কাউন্সিল আইন প্রণয়ন করেন, তখনও অনেক দেশে এ বিষয়ে আইন প্রণীত হয়নি। জাতির পিতা সাড়ে তিন বছরের মধ্যে এমন অনেক আইন করেছিলেন, যা জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সমুদ্রসীমা জয় করতে পারতাম না যদি বঙ্গবন্ধু তাঁর আমলে দেশকে আনক্লজ (UNCLOS-United Nations Convention on the Law of the Sea)-এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না করতেন। আমাদের তেল-গ্যাসক্ষেত্রগুলোর মালিকানাও বঙ্গবন্ধু প্রণীত আইনের কারণেই বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমরা নিতে পেরেছি। প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দীন আহম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন তথ্যসচিব কামরুন নাহার।

সিনেমা হল বাঁচালে চলচ্চিত্র শিল্প ও শিল্পীরা বাঁচবে

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, সিনেমা হল বাঁচলে চলচ্চিত্র শিল্প ও শিল্পীরা বাঁচবে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতি (বিএফপিডিএ), বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন তিনি। তথ্যসচিব কামরুন নাহার সভাটি পরিচালনা করেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকটা সমিতির সাথে আমি আলাদা আলাদাভাবে বসেছি। আজকে আমি একসাথে বসার আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলাম। কারণ, প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলো হল বন্ধ হয়ে গেছে। হল না থাকলে চলচ্চিত্র বাঁচবে না, আর চলচ্চিত্র না বাঁচলে শিল্পীরাও বাঁচবে না। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যম হচ্ছে হল। কিছু কিছু টেলিভিশনে রিলিজ করা হয়। কিন্তু মূল মাধ্যম হচ্ছে হল। প্রযোজক সমিতির সভাপতি যথার্থই বলেছেন, এখন হল বাঁচলে চলচ্চিত্র বাঁচবে। আবার প্রযোজকদের অসুবিধা হলো,

তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২০ জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে নিটল-আয়াত-নিউজ নাউ বাংলা এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড বিজয়ীদেরকে ক্রেস্ট প্রদান করেন–পিআইডি

একটি ছবি যখন তারা নির্মাণ করেন, তখন টাকা উঠে আসে না। অর্থাৎ সমস্যা এখানে বহুমুখী। হল মালিকদের দাবির সাথে পরিচালক ও প্রযোজক সমিতির কোনো দ্বিমত নেই, সেটি হচ্ছে মুম্বাইয়ের সিনেমাসহ নির্দিষ্ট সংখ্যক সিনেমা বিদেশ থেকে আমদানি করা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমি এ ব্যাপারে অনেকের সাথে কথা বলছি, কিন্তু শিল্পী সমিতি এখন পর্যন্ত সম্মতি দেয় নাই। আমরা সব পক্ষের সম্মতি ছাড়া সেটি করতে চাই না। অতীতে একবার করা হয়েছিল, সে নিয়ে আন্দোলন হয়েছে, অনেক বাক-বিতণ্ডা হয়েছে। কিন্তু সবাইকে মনে রাখতে হবে, আমি শিল্পী হিসেবে টিকে থাকব যদি হল থাকে। যদি শিল্পটাই হারিয়ে যায়, তাহলে শিল্পী হিসেবে টিকে থাকার সুযোগটাও থাকবে না। এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত

১লা ফেব্রুয়ারি: ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জয় লাভ করে ঢাকা উত্তরে আতিকুল ইসলাম ও ঢাকা দক্ষিণে শেখ ফজলে নূর তাপস

অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্‌বোধন

২রা ফেব্রুয়ারি: বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজশাহীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্কে 'শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার', '৭ জেলা ও ২৩ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন' এবং 'ফেনী ১১৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের' উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

জাতীয় কবিতা উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংলগ্ন হাকিম চত্বরে দুই দিনব্যাপী জাতীয় কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের এবার প্রতিপাদ্য ছিল– 'মুজিব আমার স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি'। জাতীয় কবিতা উৎসবের উদ্‌বোধন করেন কবি মহাদেব সাহা

নিরাপদ খাদ্য দিবস

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় 'নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২০'। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– সবাই মিলে হাত মিলাই, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত চাই

বিশ্ব জলাভূমি দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় বিশ্ব জলাভূমি দিবস। এবার দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল– টেকসই জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, সমৃদ্ধ জীবন

আইডিইবির জাতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২০তম আইডিইবি জাতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জনজীবনকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং কারিগরি শিক্ষার প্রতি সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৩রা ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোম্পানি (সংশোধন) আইন ২০২০ এবং ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ বাংলাদেশ আইন ২০২০-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদিত হয়

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু

দেশজুড়ে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়

বিশ্ব ক্যানসার দিবস পালিত

৪ঠা ফেব্রুয়ারি: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ক্যানসার দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আমি আছি এবং আমি থাকব ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে'

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস

৫ই ফেব্রুয়ারি: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'পড়ব বই, গড়ব দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'

ডিএমপির ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস

৮ই ফেব্রুয়ারি: ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়। এবারে দিবসটির স্লোগান ছিল– 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার'

সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গর্বে বুক ভরে যায়

৯ই ফেব্রুয়ারি: মিরপুর সেনানিবাসে শেখ হাসিনা কমপ্লেক্সে ডিএসসিএসসি কোর্সে অংশ নেওয়া দেশি-বিদেশি সামরিক কর্মকর্তাদের

সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা। এতে গর্বে তাঁর বুক ভরে যায়

মন্ত্রিসভার বৈঠক

১০ই ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন ২০২০'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদিত হয়

একনেক সভা

১১ই ফেব্রুয়ারি: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় মোট দশটি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন

ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী

১২ই ফেব্রুয়ারি: গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন প্রকল্প ও অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্কে নির্মিত শেখ কামাল আইডি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার উদ্‌বোধন করেন

জাতীয় ন্যাটোৎসব শুরু

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন সারা দেশে একযোগে আয়োজন করে জাতীয় নাট্যোৎসব ২০২০। এটি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স মাধ্যমে উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্বকাপজয়ী অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা

১২ই ফেব্রুয়ারি: মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় বিসিবি

আনসার-ভিডিপির জাতীয় সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

১৩ই ফেব্রুয়ারি: গাজিপুরের সফিপুরে বাংলাদেশে আনসার ও ভিডিপির ৪০তম জাতীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করে বলেন, আনসার বাহিনী সততা, আন্তরিকতা ও সাহসিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে

বিশ্ব বেতার দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় বিশ্ব বেতার দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'বেতার ও বৈচিত্র্য'

কৃষিবিদ দিবস পালিত

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে কৃষিবিদ দিবস। এবার দিবসটির স্লোগান ছিল– 'বঙ্গবন্ধুর অবদান কৃষিবিদ ক্লাস ওয়ান'

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালিত

১৪ই ফেব্রুয়ারি: অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আনন্দ উল্লাসে সারা দিনব্যাপী উদ্‌যাপিত হয়। বিশ্ব ভালোবাসা দিবস

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান–পিআইডি

বসন্তবরণে দেশজুড়ে বর্ণাঢ্য আয়োজন

বাসন্তী রঙের সাজ-পোশাক আর নৃত্য গান, আবৃত্তি ও কথামালায় ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করে দেশবাসী

বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস পালিত

১৫ই ফেব্রুয়ারি: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– হলে ক্যানসার, সম্ভাবনা আছে বাঁচার

মন্ত্রিসভার বৈঠক

১৭ই ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তেজগাঁওয়ে তার কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে শিশু হাসপাতাল ও শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আইন অনুমোদন লাভ করে

একনেক বৈঠক

১৮ই ফেব্রুয়ারি: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী এবং একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে ৯টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এগুলো সবই নতুন প্রকল্প। এসব প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ হাজার ৬৩৯ কোটি টাকা

একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

২০শে ফেব্রুয়ারি: ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি যেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরো বিস্তার লাভ করে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। তিনি বলেন, নিজের ভাষাকে ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। মাতৃভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ অনুষ্ঠানে ২০ ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে এবারের একুশে পদক দেওয়া হয়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

২১শে ফেব্রুয়ারি: সারা দেশে বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে ভাষা শহিদদের স্মরণ করে জাতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে

একুশের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ভূমি সেবা এক ছাদের নীচে

ভূমি সেবা দেওয়া সব দফতর ও সংস্থাকে এক ছাদের নিচে আনা হচ্ছে। এক জায়গায় সব সেবা (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) দিতে আগামী জুন থেকে ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় নির্মাণাধীন ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। এ সময় মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভূমি ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের ঘোষণা দেন মন্ত্রী।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সব সেবা দেওয়া দফতর ও সংস্থা একই ছাদের নিচে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' কার্যক্রম পরিচালনা করলে 'ভূমি সেবা হচ্ছে ডিজিটাল, বদলে যাচ্ছে দিনকাল' এ প্রতিপাদ্যে চলমান ডিজিটাল ভূমি সেবা কার্যক্রম আরো বেগবান হবে বলে মনে করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

২০ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন দুটি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ৩১ হাজার বর্গমিটারের বেশি স্থান সংকুলান হবে। এতে ১৫০টি গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধাও থাকবে ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড ইত্যাদি অফিস ছাড়াও ফুড ক্যাফে, প্রার্থনা স্থান, ব্যাংক ও বুথ ইত্যাদি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। গণপূর্ত অধিদফতর এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের যৌথ তত্ত্বাবধানে 'ভূমি ভবন কমপ্লেক্স' নির্মিত হবে।

রাজশাহী সাজবে নতুন সাজে

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের জন্য জাতীয় অর্থ কমিটির সভায় (একনেক) তিন হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯শে ফেব্রুয়ারি এ অনুমোদন দেন। এ অর্থ বরাদ্দ পাওয়ায় অনেকটা স্বপ্নের নগরীই হয়ে উঠবে রাজশাহী। ১০৭ ধরনের কাজের বিপরীতে এই টাকা খরচ হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হবে নগরীর ভিতর দিয়ে যাওয়া তিনটি মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, রেলক্রসিংয়ের ওপর দিয়ে ছয়টি ফ্লাইওভার, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ১২টি ওভারব্রিজ নির্মাণ, এক হাজার ৮০০টি গলির রাস্তা সংস্কার ও নির্মাণ এবং তিনটি বিনোদন কেন্দ্রের উন্নয়ন। রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' নামে এই প্রকল্পটি পাস হয়েছে। এখন অর্থ বরাদ্দ পেলেই এই নগরীকে ঢেলে সাজানো যাবে। এছাড়া নগরীর এক হাজার ৮০০টি অলি-গলির রাস্তা পাকাকরণসহ ড্রেন নির্মাণ করা হবে এই প্রকল্পের আওতায়। এর আগে একসঙ্গে এতগুলো রাস্তা সংস্কার ও ড্রেন নির্মাণকাজ হাতে নিতে পারেনি রাসিক।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-কাঠমান্ডু সম্পর্ক উন্নয়নে হবে টাস্কফোর্স

নেপাল থেকে বাংলাদেশে আসবে প্রায় ৫শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। অপরদিকে সৈয়দপুর বিমানবন্দর এবং মোংলা সমুদ্রবন্দর ব্যবহার নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে প্রতিবেশী দেশটি। এছাড়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তিসহ (পিটিএ) সম্পর্কের সার্বিক খাতে উন্নতি ঘটাতে দুই দেশের টাস্কফোর্স গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৈঠকে ঢাকার পক্ষে নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন। অন্যদিকে তিন দিনের ঢাকা সফররত নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ কুমার গাওয়ালি কাঠমান্ডুর পক্ষে নেতৃত্ব দেন। সেখানে বাণিজ্য, জলবায়ু, পর্যটন, যোগাযোগ, কৃষি, আইসিটি, নবায়নযোগ্য শক্তি, মানব সম্পদসহ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সব বিষয়ে আলোচনা হয় বলে বৈঠক সূত্রে জানা যায়।

নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ কুমার গাওয়ালি বলেন, দুই দেশের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি খুব শিগগিরই সই হবে। এজন্য আমরা টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবে। তিনি আরো বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তি, যোগাযোগ, জলবায়ু খাতেও আমরা একে অন্যকে সাহায্য করব। সামনের দিনগুলোয় এসব ইস্যুতে দুই দেশের সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হবে।

এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বলেন, খুব আন্তরিক পরিবেশে বৈঠকটি হয়েছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক একাধিক

ইস্যুতে নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা দুই দেশ একে অন্যকে সহায়তা করতে আরো শক্তিশালী ভূমিকা রাখব। নেপাল আমাদের মোংলা বন্দর ব্যবহার করতে চায়, বলেছি– এতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ঘটাতে আকাশপথ ও নৌপথে দুই দেশের মধ্যে আরো শক্তিশালী সম্পর্ক হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, নেপালের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব আসছে সৈয়দপুর বিমানবন্দর ব্যবহারের জন্য। আমরা স্বাগত জানিয়েছি। টেকনিক্যাল কমিটি দেখবে সেখানে কী ধরনের বিমান যাতায়াত করতে পারে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরটি বেশ বড়ো। বর্তমানে প্রায় ১২-১৪টি ফ্লাইট সেখানে ঢাকা থেকে যায়। ফলে নেপাল থেকে এসেই যে কেউ ঢাকায় আসতে পারবে কানেকটিভিটির কারণে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Pradeep Kumar Gyawali-এর নেতৃত্বে ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ স্ব স্ব দেশের প্রতিনিধিদল ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

রাজশাহীর শেখ কামাল আইটি সেন্টার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহীর বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কের শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার উদ্‌বোধন করেছেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি ট্রেনিং সেন্টারটির উদ্‌বোধন করেন। এর মাধ্যমে বহুল প্রতীক্ষিত হাইটেক পার্কের ভেতর প্রথম কোনো কার্যক্রম শুরু হলো।

এই উদ্‌বোধন উপলক্ষে রাজশাহীর ট্রেনিং সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ট্রেনিং সেন্টার থেকে ছেলেমেয়েরা যে ট্রেনিং নেবে তার মাধ্যমে তারা নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারবে। তারা চাকরি নেবে না, চাকরি দেবে। তিনি আরও বলেন, ছেলেমেয়েদের আইটিতে দক্ষ করে তুলতে আমরা বাজেটে আলাদা ফান্ড রেখে দিয়েছি। তাছাড়া কর্মসংস্থান ব্যাংক ও এসএমই'র মাধ্যমে টাকা দিয়েও আমরা সুযোগ করে দিচ্ছি।

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে এই প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন পায়। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের ১৮ই জুলাই রাজশাহী মহানগরীর জিয়ানগর এলাকায় ৩১ দশমিক ৬৩ একর জমির ওপর ২৮১ কোটি ১৯ লাখ টাকা ব্যয়ে হাইটেক পার্কটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালির আদলে নির্মাণাধীন পার্কটির দুটি অংশ থাকবে। মূল পার্কটি হবে ১০ তলা বিশিষ্ট এবং পাশে ৬২ হাজার বর্গফুট আয়তনের পাঁচতলা বিশিষ্ট ইনকিউবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টার থাকবে।

ই-কমার্সে ৩০ জন সফল নারী উদ্যোক্তার সম্মাননা

দেশের ৩০ জন নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা জানিয়েছে উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ফোরাম (উই)। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সংগঠনটির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগিতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে সম্মাননা ও পুরস্কার তুলে দেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁও আইসিটি টাওয়ারে দিনব্যাপী চারটি সেমিনার ও বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়।

আইসিটি বিভাগে প্রথম পেপারলেস সভা

ভাষা আন্দোলনের মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো পেপারলেস সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বিভাগের সভাকক্ষে দেশে ডেভেলপ করা জিআরপি

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগে প্রথম পেপারলেস সভা করেছেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক

সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং বিভাগের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৭শে জানুয়ারি ২০২০ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালকে ক্রেস্ট প্রদান করেন–পিআইডি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষার্থীদের ২৯২ কোটি টাকা দেওয়ার ঘোষণা

মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সারা দেশে সমন্বিত শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় ৯ লাখ ৯১ হাজার ৫৮২ জন শিক্ষার্থীকে ২৯২ কোটি ২৪ লাখ ৯২ হাজার ৮১০ টাকা দেওয়ার ঘোষণা দেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মণি। ২৪শে ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে আয়োজিত উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ ঘোষণা দেন। অনুষ্ঠানে দীপু মণি বলেন, এখন থেকে সরাসরি সুবিধাভোগীদের হাতে উপবৃত্তির টাকা যাবে। মধ্যস্বত্বভোগীরা কোনো সুবিধা পাবে না। পরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বরিশালের দুটি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন শিক্ষামন্ত্রী।

সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে মাদককে রুখার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৭শে জানুয়ারি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মূলত জ্ঞানচর্চা মুক্তচিন্তা আর মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্র, টাকা কামানো আর র‍্যাগিংয়ের জায়গা নয়। তিনি শিক্ষার্থীদের অর্জিত ডিগ্রি ও সম্মানবোধকে ভূলুণ্ঠিত না করার, বিবেকের কাছে কখনো পরাজিত না হওয়ার আহ্বান জানান। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্র ও সে বিষয়ে কার্যকর, প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহারিক কার্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে বলে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, সারাদেশে মাদকে সয়লাব। সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে মাদককে রুখে দিতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এলক্ষ্যে শিক্ষার্থী, তরুণসমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। অনুষ্ঠানে ২ হাজার ৮৮৮ জন গ্রাজুয়েটকে ডিগ্রি এবং শিক্ষায় অসামান্য অবদানের স্বাকৃতিস্বরূপ ১৪ জন শিক্ষার্থীকে চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি।

প্রতিবেদনঃ মো. সেলিম

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

২১টি প্রতিষ্ঠান পাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার

দেশের শিল্প খাতে অবদান রাখায় চলতি বছর থেকে প্রবর্তন করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০'। সাতটি ক্যাটাগরিতে ২১টি প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে পুরস্কারের জন্য সাতটি ক্যাটাগরিতে ১৯১টি আবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা পড়েছে। এর মধ্যে বৃহৎ শিল্পে ৭১টি, মাঝারি শিল্পে ৪৭টি, ক্ষুদ্র শিল্পে ২৫টি, মাইক্রো শিল্পে ২১টি, হাইটেক শিল্পে ৬টি, কুটিরশিল্পে ৮টি এবং হস্ত ও কারুশিল্পে ১৩টি আবেদন এসেছে। সাতটি ক্যাটাগরিতে ১ম, ২য়, ও ৩য় স্থান বিজয়ী হিসেবে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভায় এ তথ্য জানানো হয়। উল্লেখ্য মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত জাতীয় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম হিসেবে এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়।

১৭টি পণ্য আমদানিতে অগ্রাধিকার দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য হিসেবে ঘোষিত ১৭টি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পণ্যগুলো হলো– সয়াবিন তেল, পাম তেল, পেঁয়াজ, চিনি, রসুন, মসুরি ডাল, ছোলা, শুকনা মরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, ধনে, জিরা, আদা, হলুদ তেজপাতা ও ভোজ্য লবণ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ২০১২ সালে এক প্রজ্ঞাপনে এসব পণ্যকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

প্রতিবেদনঃ মোঃ জামাল উদ্দিন

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে জাপান-বাংলাদেশ জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, জাপান বাংলাদেশের উন্নয়নের অংশীদার। জাইকাসহ বেশ কিছু সংস্থা বাংলাদেশে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। জাপান-বাংলাদেশ জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধান করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুদিনের মধ্যে জাপান সফর করবেন। এ সময় বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা কমিশন এবং জাপানের জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের মধ্যে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়া উভয় দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেটরো) এবং বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী করা হচ্ছে। আশা করা যায়, আগামী দিনগুলোকে বাংলাদেশের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অনেক বৃদ্ধি পাবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির সঙ্গে ১৯ শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকায় তাঁর অফিস কক্ষে জাপানের রাষ্ট্রদূত Ito Naoki সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

বাণিজ্যমন্ত্রী ১৯শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি (ITO Naoki)-এর সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন এলাকায় একশটি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক দেশ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছে। জাপানেরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। গত বছর বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ এসেছে জাপান থেকে। জাপানের সাথে বাংলাদেশে বাণিজ্যও বাড়ছে। জাপানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, চামড়া ও পাটজাত পণ্যসহ অন্যান্য পণ্যের অনেক চাহিদা রয়েছে।

পুঁজিবাজারে আসছে আরো চারটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, সারা বিশ্বের অর্থনীতির বিবেচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা ভালো। শেয়ার বাজার চাঙ্গা করতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ দরকার। পুঁজিবাজার শক্তিশালী করতে আরো চারটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক পুঁজিবাজারে নিয়ে আসা হচ্ছে। সরকারি মালিকানাধীন চার ব্যাংকের শেয়ার একযোগে পুঁজিবাজারে ছাড়া হলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো শেয়ার ছাড়লে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা বাজারে ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়। ফলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ছাড়া হলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা ফিরে আসবে। ইতোমধ্যে পুঁজিবাজারে সূচক বাড়াতে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোকে পুঁজিবাজারে আনার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করতে ৯ই ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংশ্লিটদের সঙ্গে বৈঠক শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বাজারে তালিকাভুক্ত রূপালী ব্যাংকের শেয়ার বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হবে। পাশাপাশি নতুনভাবে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে (বিডিবিএল) নিয়ে আসা হবে। এরপর অগ্রণী, জনতা এবং সর্বশেষ সোনালী ব্যাংককে নিয়ে আসা হবে। এ বিষয়ে একটি কমিটিও করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর মধ্যেই এগুলোকে নিয়ে আসা হবে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্য

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করার জন্য যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগকারীদের জন্য এখন সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্য। প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

'ইনভেস্টিং ইন ডিজিটাল বাংলাদেশ : ফিনটেক টু হাইটেক' শীর্ষক এ সেমিনারে যুক্তরাজ্যের ডিজিটাল, কালচারাল, মিডিয়া অ্যান্ড স্পোর্টস মন্ত্রী ম্যাট ওয়ারম্যান, লর্ড রনবীর সিং সুরি, লর্ড ডেবিড হাওয়েল, লর্ড জিতেস গাডিহা, ভেলিরি ভাজ এমপি, স্টিফেন ম্যাটক্লিপ এমপি ও স্টিফেন টিমস এমপি-সহ প্রায় ১৫০ জন ব্রিটিশ ও বাংলাদেশি-ব্রিটিশ উদ্যোক্তা এবং বাংলাদেশি-ব্রিটিশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষিসহ উচ্চশিক্ষায় নারীরা এগিয়ে

চলতি শিক্ষাবর্ষে কৃষি বিষয়ক উচ্চশিক্ষায় দেশের সাতটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্রদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে ছাত্রীরা। অভিন্ন প্রশ্নপত্রে এক পরীক্ষার মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য যত শিক্ষার্থী মনোনীত হয়েছেন তাদের মধ্যে ৫০ দশমিক ৪২ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী। আর ছাত্র ৪৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ। তবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী ছিলেন ৪৪ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

এবারে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যেও নারীদের এগিয়ে থাকার চিত্র বেশি। যেমন: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার প্রথমবর্ষে মোট ১ হাজার ১০৮ জন ভর্তি হন এর মধ্যে ছাত্রী ৬০৩ জন আর ছাত্র

৫০৫ জন। অর্থাৎ এখানে ছাত্রী ভর্তির হার ৫৪ শতাংশের বেশি। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৫১ জন ছাত্রী, আর ছাত্র ৩২০ জন। খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫ জন ছাত্রী ৬৭ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছেন।

এর আগে গত শিক্ষাবর্ষে চিকিৎসা শিক্ষা খাতেও নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি ছিল। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ ছাত্রী এবং ৪০ শতাংশ ছাত্র ছিলেন।

এছাড়া আরো কয়েক বছর আগেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ভর্তিতে ছাত্রদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় ছাত্রীরা। বাংলাদেশে শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য অনুযায়ী। প্রাথমিকে এখন মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫০ দশমিক ৭৫ শতাংশ ছাত্রী। আর মাধ্যমিকে ছাত্রীদের এই হার ৫৪ শতাংশ কলেজ ও উচ্চশিক্ষার অন্যান্য স্তরে নারী পিছিয়ে থাকলেও সেখানেও নারীদের অংশগ্রহণ প্রতিবছর বাড়ছে।

নারী-পুরুষ সমতার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান সবার শীর্ষে। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ওয়েব সাইটে প্রকাশিত বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্য প্রতিবেদন ২০২০-এ তথ্য ওঠে এসেছে। প্রতিবেদনে ১৫৩টি দেশের নারী-পুরুষের সমতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বৈশ্বিক সূচক বাংলাদেশের অবস্থান ৫০, যা আগের বছর ছিল ৪৮, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের পর রয়েছে নেপাল, অবস্থান ১০১তম। শ্রীলঙ্কা ১০২, ভারত ১১২, মালদ্বীপ ১২৩, ভুটান ১৩১ এবং পাকিস্তানের অবস্থান ১৫১তম।

নারী অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ, শিক্ষায় অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য ও আয়ু এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন– এই চার মূল সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে অবস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি ১৪টি উপসূচকের মধ্যে চারটি উপসূচকে বাংলাদেশ বিশ্বের সব দেশের উপরে স্থান পেয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো– ছেলে ও মেয়েশিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, মাধ্যমিকে ছেলে ও মেয়েদের সমতা, জন্মের সময় ছেলে ও মেয়েশিশুর সংখ্যাগত সমতা এবং সরকার প্রধান হিসেবে কত সময় ধরে একজন নারী ক্ষমতায় রয়েছেন।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। দীর্ঘ সময় ধরে গত ৫০ বছরে সরকার প্রধান নারী থাকার রেকর্ডও বাংলাদেশের।

নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রকল্প করপোরেট কানেক্ট ২০২০ কনফারেন্স ও ব্যবসা মেলায় বিশ্বব্যাংক ও ইকানেক্ট ইন্টারন্যাশনালের নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে নেওয়া নতুন একটি প্রকল্প উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ৯ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর র‍্যাডিসন হোটেলে আয়োজিত এ মেলায় বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নারী মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের বাজার প্রবেশাধিকার ও করপোরেট ভ্যালু চেইন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ নতুন প্রকল্প চালু করা হয়, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। বিশ্বব্যাংকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় প্রকল্পটির আওতায় দেশে নারী মালিকানায় পারিচালিত ১ হাজার ২০০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সম্ভাব্য স্থানীয় বৃহৎ ও বহুজাতিক করপোরেট ক্রেতার সঙ্গেই সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে নারী উদ্যোক্তরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভালো দাম পাবে এবং তাদের সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ মিলবে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষে বাড়ি পাবেন ১৪ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা

মুজিববর্ষ উপলক্ষে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। মুজিববর্ষে ১৪ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি করে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

১৬ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ অধিবেশনে কার্যপ্রণালি বিধির ৭১ বিধিতে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শাজাহান খানের নোটিশের জবাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুজিববর্ষে বাড়ি নির্মাণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। মুজিববর্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানার্থে ১৪ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি করে বাড়ি নির্মাণ করে দিবে সরকার। এছাড়া স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতেও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

তিনি আরো বলেন, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম সম্মানিত করা শুরু হয়। তখন ৩০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হতো ৪০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে। সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে আজ ১২ হাজার টাকায় উন্নীত হয়েছে এবং ৪০ হাজারের স্থলে শতভাগ মুক্তিযোদ্ধাই এ ভাতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। আগামী বাজেটে এ ভাতা আরও বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

কৃষি খাতে বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১০ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ক্রিস্টাল বলরুমে দুই দেশের মধ্যে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও সফররত কানাডার সাসকাচোয়ান সরকারের কৃষিমন্ত্রী ডেভিড মারিট (David Marit) এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) স্বাক্ষর করেন বিএআরসি নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এবং কানাডার জিআইএফএস চিফ অপারেটিং অফিসার স্টিভ ভিসার (Steve Visscher)। কানাডার সাসকাচোয়ান (ইউএসএএসসি) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) নিরাপদ খাদ্য, টেকসই কৃষি উন্নয়নে সহায়তার জন্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বিকাশের অংশীদারিত্বের কাজ করতে সম্মত হয়েছে দেশ দুটি। কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, সীমিত সম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে যাচ্ছে সবজি। এছাড়া ধান, গম ও ভুট্টা বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই এগিয়ে চলছে দেশ। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম। সাসকাচোয়ান কৃষিমন্ত্রী ডেভিড মেরিট বলেন, রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তির ভূমিকা প্রধান, যার প্রকৃত উদাহরণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ কৃষিতে অনেক ভালো করেছে। তিনি বাংলাদেশের সাথে একত্রে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে এ সম্পর্ককে আরো জোরদার করে কৃষি উন্নয়নে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি।

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং কানাডার Saskatchewan প্রদেশের কৃষিমন্ত্রী David Marit-এর উপস্থিতিতে ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে নিরাপদ খাদ্য ও টেকসই কৃষি উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে দু'দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়–পিআইডি

জাপানে রপ্তানি হবে ৪০০ মেট্রিক টন মধু

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কৃষির আধুনিকায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণে মধু একটি নতুন সংযোজন যা কৃষির রপ্তানি বহুমুখীকরণে সহযোগিতা করবে। আগে মধু সীমিত আকারে উৎপাদিত হলেও এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু হয়েছে। জাপানে বাংলাদেশের মধু রপ্তানি হচ্ছে। এ বছর ৪শ মেট্রিক টনের অর্ডার পাওয়া গেছে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) চত্বরে তিন দিনব্যাপী 'জাতীয় মৌ মেলা ২০২০'-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। মেলা উপলক্ষে বিএআরসি অডিটোরিয়ামে 'পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মৌ চাষ' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার ছিল পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা। পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করতে মধু একটি অনন্য খাদ্য। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে মৌমাছি পালন ও এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। মৌ চাষ সম্প্রসারণ পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরাগায়ণের মাধ্যমে ফল ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই ফসলের মাঠে মৌ চাষ কৃষকের জন্য বাড়তি আয়ের সংস্থান করে থাকে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান ও বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। চতুর্থবারের মতো এ মেলার আয়োজন করে কৃষি মন্ত্রণালয়। এবারের মেলায় সরকারি ৬টি ও বেসরকারি ৬৮টি প্রতিষ্ঠানের ৭৪টি স্টল স্থান পায়। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মেলা চলে ১৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

মিষ্টি আলুর নতুন জাত উদ্ভাবন

মিষ্টি আলুর নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের গবেষকরা। দীর্ঘ ১৩ বছর গবেষণা করে পার্পল স্টার (এসএইড সুইট পটেটো-১) নামের নতুন জাত উদ্ভাবনে সফল হয়েছেন তারা। নতুন এই জাতের অনুমোদনও দিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত জাতীয় বীজ বোর্ড।

গবেষক দলের প্রধান মো. জামাল উদ্দিন জানান, পার্পল স্টার উচ্চফলনশীল মিষ্টি আলুর জাত। গায়ের রং বেগুনি থেকেই মূলত এর নামকরণ। প্রতি হেক্টরে এর ফলন প্রায় ৪৮-৫০ টন, যা প্রচলিত জাতগুলোর তুলনায় ৫-৮ টন বেশি। এই জাতের প্রতিটি আলুর ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। এছাড়া সাধারণ সাদা আলুর চেয়ে এর মিষ্টতাও অনেক বেশি। এই আলু অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ, যা ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়তা করে। অধিক পুষ্টিমানের এই আলু চাষে বিশেষ কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। তাই কৃষকরা সহজেই এটি চাষ করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

বিদ্যুতের আলো পেল পদ্মা চরের মানুষ

শরীয়তপুরে পদ্মার চরের সুবিধাবঞ্চিত এক হাজার পরিবার পেল বিদ্যুতের আলো। দুর্গম এলাকা হওয়ায় সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে চরাঞ্চলে এ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মুজিববর্ষের এ উপহার পেয়ে উৎফুল্ল নড়িয়া উপজেলার চরআত্রা এবং নওপাড়া ইউনিয়নের মানুষ। ১৫ই ফেব্রুয়ারি চরআত্রা আজিজিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও শরীয়তপুর-২ আসনের এমপি একেএম এনামুল হক শামীম এ বিদ্যুৎ সংযোগ উদ্‌বোধন করেন। মন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে সবাই এ সুবিধার আওতায় আসবে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) ঢাকা জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জয়নাল আবেদীন জানান, শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ, জাজিরা উপজেলার কুন্ডেরচর, কাঁচিকাটা ইউনিয়ন এবং চাঁদপুর জেলার তিনটি ইউনিয়নের ২০ হাজার গ্রাহককে এ সুবিধার আওতায় আনা হবে। এজন্য একটি ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র, ২০ কিলোমিটার ৩৩ কেভি লাইন, ৪০০ কিলোমিটার ১১ কেভি লাইন নির্মাণকাজ চলছে। ১০০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ বর্তমানে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষে এক লাখ নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করবে সরকার

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে দেশজুড়ে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক লাখ নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' শীর্ষক ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের (সফল নারী) সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার।

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম নারী মুক্তি ও নারী-পুরুষের সমতার কথা ভেবেছেন। এর প্রতিফলন দেখা যায় বায়াত্তরের সংবিধানে। যেখানে অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি নারী-পুরুষের সমতার কথাও বলা আছে।

আইসিটি বিষয়ে তিন লাখ তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, পুরুষের পাশাপাশি নারীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সম্পৃক্ত করলে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি-৫) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ টাঙ্গাইলে আসিয়া হাসান আলী ডিগ্রি কলেজের আইসিটি ভবনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আইসিটিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে আইসিটি বিষয়টিকে সবার কাছে জনপ্রিয় করা, আইসিটিকে বিশেষায়িত পেশা হিসেবে মূল্যায়ন করা এবং ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের বার্তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের লক্ষ্য ২০৩০ সাল নাগাদ নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। তাই গ্রাম-শহরকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সরকার ডিজিটাইলাইজেশনের উদ্যোগ নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা অব্যাহত থাকবে। বিশাল সংখ্যক তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার আইটি খাতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বছরে ৩ লাখ তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। আইটিতে মেয়েদের উৎসাহিত করতে সরকার প্রশিক্ষণে ২০-৩০ শতাংশ নারী সংরক্ষিত কোটা বরাদ্দ রেখেছে।

সরকারের লক্ষ্য সবার জন্য কর্মসংস্থান

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেন, সরকার সমাজের অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত হতদরিদ্র শিশুদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন সবার জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। প্রতিমন্ত্রী ১৪ই ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের প্রি-ভোকেশনাল দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিষয়ক সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' শীর্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জলবায়ু সম্মেলনে সফলতা

মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়েছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিভিএফ-এর সভাপতি নির্বাচনে এবারের জলবায়ু সম্মেলনের সফলতা বলে মনে করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন। মন্ত্রী বলেন, সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের সংগঠন ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ)-এর ২০২০-২০২১ মেয়াদের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো স্থাপিত বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে মত বিনিময়কালে বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ আগারগাঁয়ে 'Chile-Madrid Climate Change Conference (COP-25): Expectation, Achievement and Future Initiatives' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী ৫ই ফেব্রুয়ারি পরিবেশ অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে চিলি-মাদ্রিদ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন বা কপ-২৫: প্রত্যাশাপ্রাপ্তি এবং ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এসময় তিনি বলেন, জাতির পিতা, দেশের গুরুত্বপূর্ণ ছবি এবং সকলের অবগতির জন্য বাংলাদেশ সরকারের বিগত বছরগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অর্জন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থা গৃহীত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলি ও কার্যাবলি এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাবলি দিয়ে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নটি আকর্ষণীয় করে সজ্জিত করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ঢাবি আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। ৯ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড স্মল এথনিক কমিউনিটিস অব সাউথ অ্যান্ড সাউথইস্ট এশিয়া শীর্ষক সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্‌বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্টের সহযোগিতায় এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

রংপুর সড়কের নাম 'বঙ্গবন্ধু সড়ক'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে রংপুর নগরীতে একটি সড়কের নাম হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু সড়ক'। এই সড়কের নামফলকটি সংস্কার করা হয়েছে। রংপুরের ডিসি মোড়ে বঙ্গবন্ধু চত্বর থেকে চেকপোস্ট যাওয়ার রাস্তাটির নাম রাখা হয়েছিল 'বঙ্গবন্ধু সড়ক'। আশির দশকে বঙ্গবন্ধু সড়কের নামফলক তৈরি করা হয়। দীর্ঘদিন রং না করায় নামফলকটির চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং লেখা প্রায় মুছে যায়। ২৫শে জানুয়ারি রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও জেলা মহানগর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নামফলকটি সংস্কার করেন। এতে রং করা হয় এবং নতুন করে নাম লেখা হয়।

চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের জন্য বিআরটিসির ১০টি দ্বিতল বাস

চট্টগ্রাম নগরীতে শিক্ষার্থীদের চলাচলের সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিআরটিসির ১০টি দ্বিতল বাস উপহার দিয়েছেন। ২৬শে

জানুয়ারি থেকে সকাল-বিকাল দুই দফায় দুটি পৃথক রুটে ৫টি করে বাস চলবে। বাসগুলোতে সততা কাউন্টার থাকবে। এই বাসগুলোতে শিক্ষার্থীরা প্রতিবার যে-কোনো গন্তব্যে যাওয়ার জন্য ৫ টাকা করে ভাড়া দিবেন। ৭৫ আসনের বাসগুলোর নিচতলা ছাত্রীদের এবং দ্বিতীয় তলা ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। ২৫শে জানুয়ারি চট্টগ্রাম নগরীর এম এ আজিজ স্টেডিয়ামের জিমনেসিয়াম মাঠে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাসগুলো উদ্‌বোধন করেন উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল।

ঢাকার সাড়ে ১৩ কিমি. সড়ক চারলেনে উন্নীত

ঢাকার যানজট নিরসনে সাড়ে ১৩ কিলোমিটার মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করতে যাচ্ছে সরকার। এজন্য ১২০৯ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

পদ্মা সেতুর দৃশ্যমান ৩৪৫০ মিটার

পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ বর্তমানে ২৩তম স্প্যানটি বসানোর কারণে ৩৪৫০ মিটার দৃশ্যমান হয়েছে। শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে বসেছে এই স্প্যান। ৩রা ফেব্রুয়ারি ৬-এ আইডি নম্বরের স্প্যানটি সেতুর জাজিরা প্রান্তের ৩১ ও ৩২ নম্বর খুঁটির ওপর বসানো হয়। পদ্মা সেতুর একাধিক প্রকৌশলী এ খবর নিশ্চিত করেছে। সেতুর সহকারী প্রকৌশলী হুমায়ুন কবীর জামান, সকাল, ৮ টায় কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে তিয়ান-ই ক্রেনে করে রওনা দেয় ২৩তম স্প্যান এবং বেলা পৌনে ৩টায় ৩১ ও ৩২ নম্বর খুঁটির ওপর তা বসানো হয়। এর আগে গত ২৩শে জানুয়ারি সকালে ১-ই আইডি নম্বরের ২২তম স্প্যানটি সেতুর নম্বরের ২২তম স্প্যানটি সেতুর মাওয়া প্রান্তের ৫ ও ৬ নম্বর খুঁটির ওপর বসানো হয়। সেতুর প্রতিটি স্প্যান ১৫০ মিটার দীর্ঘ। পদ্মা সেতুর ৪২টি পিলারে ৪১টি স্প্যান বসবে। আর ৪২টি পিলারের মধ্যে ৩৭টি পিলারের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। পিলার ৮ এবং ১১-এর কাজ শিগগির শেষ হবে। পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান মোঃ আবদুল কাদের জামান, কনস্ট্রাকশন সাইটে এখন মোট ৩৫টি স্প্যান আছে যার মধ্যে ২৩টি বসানো হয়েছে। দুটি স্প্যান বাংলাদেশের পক্ষে জাহাজে আছে। বাকি চারটি চীনে তৈরি করা হচ্ছে। ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেতুটি দ্বিতল হবে, যার ওপর সড়কপথ ও নিচের অংশ থাকবে রেলপথ।

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে উদ্‌বোধন মার্চে

দেশের প্রথম ছয় লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক আগামী মার্চ মাসে উদ্‌বোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তাছাড়া ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক চারলেন উন্নয়নের কাজ জুনের মধ্যে শেষ হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। ৫ই ফেব্রুয়ারি সচিবালয় দফতর প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকদের সঙ্গে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও নাগরিক সেবা প্রদান বিষয়ক সভা শেষে এ তথ্য জানান তিনি।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রসঙ্গ করোনা ভাইরাস
আতঙ্কিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়নি

করোনা ভাইরান নিয়ে দেশে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) ৪ঠা ফেব্রুয়ারি এ খবর জানিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হননি। তবে পরিষ্কার থাকা এবং ঘরের বাইরে চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

করোনা ভাইরাস সতর্ক বার্তায় আইইডিসিআর বলছে, ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, অপরিষ্কার হাতে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির কাশি হলে শিষ্টাচার পদ্ধতি মেনে চলা, অসুস্থ পশু-পাখির সংস্পর্শে না আসা, মাছ-মাংস রান্নায় সতর্ক থাকা, ঘরের বাইরে বের হলে নাক-মুখ ঢেকে বের হওয়া এবং জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত চীন ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে জানুয়ারি ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের একটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন উদ্‌বোধন, ২টি এক্সপ্রেসের নতুন নামকরণ ও রুট বর্ধিতকরণ এবং ২টি এক্সপ্রেস ট্রেনের রেক প্রতিস্থাপন উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

বিশ্ব ক্যানসার দিবস পালন

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পালিত হয়েছে বিশ্ব ক্যানসার দিবস। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আমি আছি, আমি থাকব, ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে'। ২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত– এই তিন বছরের প্রতিপাদ্য এটি। এই রোগ সম্পর্কে ধারণা, সচেতনতা বাড়াতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই এই দিবসের আয়োজন।

দিবসটি উপলক্ষে সকাল ৮টায় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। সেখানে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে ক্যানসার হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা সহজলভ্য করার আহ্বান জানান বিশেষজ্ঞরা। লালমাটিয়ায় কমিউনিটি অনকোলজি ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্তন ক্যানসার সচেতনতা ফোরাম ও মার্চ ফর মাদারের যৌথ আয়োজনে এক আলোচনাসভায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন, প্রাথমিকভাবে ক্যানসার প্রতিরোধেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির চিকিৎসা সুবিধা বাড়িয়েছে সরকার

বাংলাদেশে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির চিকিৎসা সুবিধা দেশজুড়ে বিস্তৃত করতে ১৩টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গ্যাস্ট্রোরোলজি বিভাগ চালু করেছে সরকার। এর পাশাপাশি সারা দেশে উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতালগুলোতে ওয়েব ক্যামেরা বসানো হয়েছে। একইসঙ্গে নার্সদের আরো দক্ষ করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সরকার। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সোসাইটি অব গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির (বিএসজি) সভাপতি ডা. ক্যাথরিন এডওয়ার্ডসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ডা. ক্যাথরিন বলেন, সাত বছরের বেশি সময় ধরে বিএসজি বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির (বিজিএস) সঙ্গে শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করেছে। বিএসজি সম্প্রতি মহাখালীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে এন্ডোস্কোপির জন্য একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করতে বিজিএস-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদকসেবীর সরকারি চাকরি হবে না

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, সরকারি চাকরিতে যোগদানের আগে প্রার্থীর মধ্যে মাদকের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত হতে এখন থেকে ডোপ টেস্ট করা হবে। এই পরীক্ষায় মাদকের অস্তিত্ব পাওয়া গেলে আর সরকারি চাকরি পাবে না। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত 'অ্যাডিকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড কেয়ার (আমিক)'-এর ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আহছান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে এ অনুষ্ঠান হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশ থেকে যেভাবে জঙ্গি-সন্ত্রাস দমন করা হয়েছে, একইভাবে মাদকও বন্ধ করা হবে। এজন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সব সংস্থা কাজ করছে।

তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে মাদকমুক্ত করতেই হবে

মাদক একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা সামাজিকভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। পুলিশের একার পক্ষে মাদক নির্মূল সম্ভব নয়। তারপরও আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব এবং কঠোর হবো। মাদক একটি সমাজকে, একটি দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে দেশকে মাদকমুক্ত করতেই হবে। ১০ই ফেব্রুয়ারি পিরোজপুরে জেলা পুলিশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন আইজিপি।

আইজিপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন। তাই আমরা মাদকের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছি। পাশাপাশি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, মাদক নির্মূলে সামাজিকভাবেই সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এখানে যেমন পরিবারের কর্তব্য রয়েছে, রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সমাজপতিদেরও।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০-এর উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

এসেছে বইপ্রেমীদের প্রাণের মেলা 'বইমেলা' প্রতিবারের মতো ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিনে নয়, এবার মেলা শুরু হয় ২রা ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শীতের অপরাহ্নে এদিন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। একইসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তৃতীয় বই *আমার দেখা নয়াচীন*-এর মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বইমেলা উদ্‌বোধন করে বলেন, অমর একুশে বইমেলার মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্প সংস্কৃতিকে কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই নয় বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিতে চাই।

জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী।

মেলার উদ্‌বোধন ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী ১০ লেখকের হাতে ২০১৯ সালের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেন। এবারের পুরস্কৃতরা হলেন– কবিতায় মাকিদ হায়দার, উপন্যাসে ওয়াসি আহমেদ, প্রবন্ধ ও গবেষণায় স্বরোচিষ সরকার, অনুবাদে খায়রুল আলম সবুজ, নাটকে রতন সিদ্দিকী, কিশোর সাহিত্যে রহিম শাহ্ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাহিত্যে রফিকুল ইসলাম, বিজ্ঞান উপন্যাসে নাদিরা মজুমদার, ভ্রমণ সাহিত্যে ফারুক মইনুদ্দিন এবং লোকসাহিত্যে সাইমন জাকারিয়া।

একুশে পদক ২০২০ প্রদান

ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে ১৯৭৬ সাল থেকে প্রতিবছর সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয় 'একুশে পদক'। এবছর ২০ জনকে প্রদান করা হয় একুশে পদক। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান হিসেবে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটও পায় একুশে পদক ২০২০। ২০শে ফেব্রুয়ারি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে একুশে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এবার ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য একুশে পদক পেয়েছেন প্রয়াত আমিনুল ইসলাম বাদশা। সাংবাদিক, লেখক বাদশা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব। সংগীতে পেয়েছেন মিতা হক, ডালিয়া নওশিন ও শঙ্কর রায়। নৃত্যে একুশে পদক পেয়েছেন মো. গোলাম মোস্তফা খান। অভিনয় এবং চারুকলায় একুশে পদক পেয়েছেন যথাক্রমে এসএম মহসীন এবং অধ্যাপক শিল্পী ড. ফরিদা জামান। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য প্রয়াত হাজি আক্তার সরদার, প্রয়াত আব্দুল জব্বার এবং প্রয়াত ডা. আ. আ. ম. মেসবাহুল হক (বাচ্চু ডাক্তার) একুশে পদক পান। সাংবাদিকতায় পেয়েছেন জাফর ওয়াজেদ (আলী ওয়াজেদ জাফর)। গবেষণায় এবার দুজনকে একুশে পদক দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন– জাহাঙ্গীর আলম ও হাফেজ ক্বারী আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ ছাইফুর রহমান নিজামী শাহ। অধ্যাপক ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া শিক্ষায় একুশে পদক পেয়েছেন। অর্থনীতিতে এবার পদক পেয়েছেন অধ্যাপক ড. শামসুল আলম। সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সমাজসেবা ক্ষেত্রে একুশে পদক পান। ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ড. নুরুন নবী, প্রয়াত সিকদার আমিনুল হক ও নাজমুন নেসা পিয়ারি একুশে পদক পেয়েছেন। চিকিৎসায় পদক পান অধ্যাপক ডা. সায়েরা আখতার।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

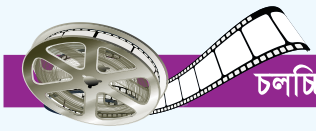

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

১৯তম আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব ১৪২৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি প্রাঙ্গণে দুই বাংলার ১৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য, তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব ১৪২৬'। ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে এ চলচ্চিত্র উৎসব চলে ১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পাঁচদিনব্যাপী প্রদর্শিত হয় দুই বাংলার চলচ্চিত্র। এ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর টিকিটের শুভেচ্ছা মূল্য ৩০ টাকা। এ বছর উৎসবের ১৯তম আসরে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি বাংলাদেশি কালজয়ী চলচ্চিত্রের ফেস্টুন ও চলচ্চিত্র কুশলীদের তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। উৎসব চলাকালে পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা অঞ্জন দত্ত, নির্মাতা হাসিবুর রেজা কল্লোল, ন ডরাই, ইতি তোমারই ঢাকা, কাঠবিড়ালী ছবির কলাকুশলীসহ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উৎসব প্রাঙ্গণে হাজির ছিলেন। উৎসবের শেষদিন প্রতিবারের মতো উপমহাদেশের প্রথম

চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেন স্মরণে অনুষ্ঠিত হয় 'হীরালাল সেন পদক প্রদান' ও সমাপনী অনুষ্ঠান। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান। এ উৎসবের প্রতিটি আয়োজন সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

৬৫তম অ্যামাজন ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস

আসামের গৌহাটির ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে (সারুসাজাই স্পোর্টস কমপ্লেক্স) ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৬৫তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসের আসর বসেছিল। তারকাখচিত অনুষ্ঠানটির সঞ্চালন করেন অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান, ভিকি কৌশল ও নির্মাতা করণ জোহর। মঞ্চে গানের তালে নেচে দর্শক মাতিয়েছেন অক্ষয় কুমার, রণবীর সিং, আয়ুষ্মান খুরানা ও কার্তিক আরিয়ান। বলিউডের অস্কারতুল্য ৬৫তম অ্যামাজন ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসে সেরা চলচ্চিত্রসহ সর্বাধিক ১৩টি পুরস্কার জিতে নেয় 'গালি বয়'। এ ছবিটির মূল ভূমিকায় অনবদ্য নৈপুণ্য দেখিয়ে সেরা অভিনেতা হয়েছেন রণবীর সিং। একই ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর সম্মান জিতেছেন আলিয়া ভাট। গালি বয় বানিয়ে সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন জোয়া আখতার।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে 'আমার ভাষার চলচ্চিত্র ১৪২৬' উৎসবের সমাপনী এবং হীরালাল সেন পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

এ ছবিটিতে অভিনয় করে সিদ্ধান্ত চতুর্বেদি সেরাসহ অভিনেতা ও অমরুতা সুভাষ সেরাসহ অভিনেত্রী হয়েছেন। এছাড়া সেরা মিউজিক অ্যালবাম, সেরা গীতিকার, সেরা চিত্রনাট্যকার ও সেরা সংলাপের স্বীকৃতি এসেছে ছবিটির ঘরে। এবারের আসরে সেরা নবাগতা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন অনন্যা পান্ডে। সমালোচকদের পছন্দে সেরা চলচ্চিত্র হয়েছে আর্টিক্যাল ফিফটিন। ছবিটিতে অনবদ্য অভিনয়ের সুবাদে সমালোচকদের দৃষ্টিতে সেরা অভিনেতার স্বীকৃতি পেয়েছেন আয়ুষ্মান খুরানা। এ ফিল্মফেয়ারের মর্যাদাসম্পন্ন ব্ল্যাক লেডি (ট্রফি) ঘরে নিয়েছেন বলিউডের বেশ কয়েকজন তারকা। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতের কালারস টিভি চ্যানেলে রাত ৯টা ৩০ মিনিটে প্রচার হয় অনুষ্ঠানের ধারণকৃত পর্ব।

প্রতিবেদন: মিতা খান

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশুর জীবনমান উন্নয়নে ১৪৩তম বাংলাদেশ

শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৩তম। অন্যদিকে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণকারীদের মধ্যে বাংলাদেশ ৩৯তম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), ইউনিসেফ এবং দ্য লেনসেট গঠিত একটি কমিশনের প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। এ ফিউচার ফর দ্য ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন (শিশুদের জন্য একটি ভবিষ্যৎ) শিরোনামে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৪০ জনেরও বেশি শিশু-কিশোর স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। ১৯শে ফেব্রুয়ারি প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে দ্য লেনসেট নামের মেডিক্যাল জার্নালে। এতে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন ও নিচু মানের খাবারের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে শিশুদের রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে বিশ্ব। ফাস্টফুড, মিষ্টি পানীয়, অ্যালকোহল আর তামাকের অভ্যাস গড়ে উঠছে শিশুদের মধ্যে, যা তাদের স্বাস্থ্যকে সংকটে ফেলছে। অন্যদিকে অতিমাত্রায় কার্বন নির্গমনেও তাদের ওপর অতিরিক্ত স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। তাপদাহ থেকে শুরু করে মৌসুমি বিভিন্ন রোগের বিস্তার ঘটাচ্ছে। আর সবচেয়ে বেশি কার্বন নির্গমন করছে ধনী দেশগুলো।

এই কমিশনের সহকারী প্রধান নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্লার্ক বলেন, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে বাস করা পাঁচ বছরের কম বয়সি ২৫ কোটি শিশু অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের কারণে তাদের সম্ভাবনা অনুযায়ী বেড়ে না ওঠার ঝুঁকিতে রয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বে মোটা হয়ে যাওয়া শিশুর সংখ্যা ১৯৭৫ সাল থেকে ১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৪০ লাখ।

পাবলিক পরীক্ষার ফলে গ্রেড-৪ চূড়ান্ত

পাবলিক পরীক্ষার ফলে গ্রেড-৪ নির্ধারণের রূপরেখা চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও গেজেট জারির অপেক্ষায়। চলতি বছর থেকেই এ গ্রেডিং পদ্ধতি কার্যকর হচ্ছে। বর্তমানে পাবলিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফল জিপিএ ৫-এ ফল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ফল প্রকাশ করা হয় সিজিপিএ ৪-এ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সব ধরনের ফলই প্রকাশ করা হয় জিপিএ-৪ গ্রেডে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলের সঙ্গে উচ্চশিক্ষার ফলের সমন্বয় করার সময় চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যায় পড়েন। বিদেশে পড়ালেখা করতে গিয়েও শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়েন। এসব সমস্যা নিরসনে জিপিএ-৪ গ্রেডে ফল প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষা প্রশাসন।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

উন্নয়নের প্রশ্নে পাহাড় আর সমতলে কোনো বিভাজন নেই

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমানেরও উন্নতি হয়েছে। সমতলের মতো পাহাড়েও লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। উন্নয়নের প্রশ্নে পাহাড় ও সমতলে কোনো বিভাজন নেই। ৬ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি সদরের কুমিল্লা এলাকায় বঙ্গবন্ধু পৌর আবাসন প্রকল্পের উদ্‌বোধন শেষে আয়োজিত এক সভায় এসব কথা বলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু পৌর আবাসন প্রকল্পের আওতায় ৩৩ সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মূলত এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী, গৃহহীন, ভূমিহীন ও হতদরিদ্ররা আবাসন সুবিধা পাচ্ছে। তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় ৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে খাগড়াছড়ি পৌরসভা। এছাড়া সেদিন ২টি রাস্তা ও খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর উন্নয়ন প্রকল্পসহ আরো বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চায় সরকার

সরকার দেশের ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চায়। শুধু ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী নয়, পিছিয়ে পড়া যত জনগোষ্ঠী রয়েছে সবাইকে এক কাতারে এনে সোনার বাংলা গড়াই সরকারের উদ্দেশ্য। ৬ই ফেব্রুয়ারি খাদ্যমন্ত্রী নওগাঁর সাপাহার উপজেলা অডিটোরিয়ামে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত শিক্ষা উপবৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ, স্বাস্থ্য উপকরণ এবং সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সবাইকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এবং এই শিক্ষার জন্য যত রকম প্রণোদনা দেওয়ার দরকার সরকার তার সবকিছু দিয়ে যাচ্ছে। এরপর তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ করেন এবং এলজিইডি'র বাস্তবায়নে ৪ কোটি ৫৪ লাখ ২৭ হাজার টাকা ব্যয়ে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের বেইস ঢালাই কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

জুনিয়র টাইগারদের বিশ্বকাপ জয়

অধিনায়ক আকবর আলীর দায়িত্বশীল ব্যাটে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে দাপট দেখিয়ে রেকর্ড গড়ে জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট চারবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে তিন উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ। ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪৭.২ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ১৭৭ রান করে ভারত। জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ডার্ক লুইস পদ্ধতিতে ৪৬ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে ৪২.১ ওভারে ১৭০ রান করে ৩ উইকেটের জয় তুলে নেয় টাইগার যুবারা। যে- কোনো স্তরের ক্রিকেটে কোনো বিশ্বকাপ জিতা বাংলাদেশের জন্যে এটাই প্রথম। তাছাড়া ১৯৯৭ সালের পর এই প্রথম ক্রিকেটের কোনো বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের ট্রফি জিতল বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই দাপটের সাথে খেলে আসা টাইগার যুবারা শেষ পর্যন্ত সক্ষম হলো নিজের ঘরে বিশ্বকাপ ট্রফি আনতে।

টাইগার যুবাদের সঙ্গে চুক্তি ঘোষণা

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী হওয়ায় জুনিয়র টাইগারদের সঙ্গে দুই বছরের জন্য চুক্তি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ১২ই ফেব্রুয়ারি বিসিবির মিডিয়া কনফারেন্স রুমে এ ঘোষণা দেন বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান পাপন।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে জুনিয়র টাইগারদের বিশ্বকাপ জয়

তিনি জানান, আকবর-তৌহিদরা প্রতি মাসে এক লাখ টাকা করে পাবেন। এ সময় পাপন আরও বলেন, তারা আমাদেরকে যেটা এনে দিয়েছে বাংলাদেশের কোনো ইভেন্টে আজ পর্যন্ত এমন কোনও পুরস্কার আসেনি। তারা আমাদের ক্রিকেটকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা জাতীয় গোল্ডকাপ ২০২০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট শুরু হয় ২৪শে ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন স্কুলের খুদে ফুটবলারদের নিয়ে আয়োজিত এ টুর্নামেন্টের বালক বিভাগে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ১,১৩,০৫০ জন এবং বালিকা বিভাগে ১১,৮২৬ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে।

দেশের ফুটবলের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিভাবান ফুটবলার তুলে আনার জন্য কয়েক বছর আগে শুরু করেছে বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) ও বঙ্গমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালিকা) ফুটবল টুর্নামেন্ট। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে এবং ওই টুর্নামেন্ট থেকে উঠে আসা ফুটবলারদের খেলার সুযোগ অব্যাহত রাখতে সরকারের দ্বিতীয় প্রকল্প যুবাদের নিয়ে টুর্নামেন্ট। যার নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ।

এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল এমপি জানিয়েছেন, আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর তৃণমূল পর্যায় থেকে তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় তুলে আনার লক্ষ্যে এই বয়সভিত্তিক খেলাগুলো চালু করেছি। গত আসরে এই টুর্নামেন্ট থেকে বাছাই করে ৪২ জনকে বিকেএসপিতে ৩ মাস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে চারজনকে আমরা ব্রাজিলে পাঠিয়েছিলাম উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য। আগামীতেও এর ধারাবাহিকতা থাকবে আমাদের।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশ এখন

ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

না ফেরার দেশে মুভি মোগল জাহাঙ্গীর খান

আফরোজা রুমা

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'মুভি মোগল' খ্যাত কিংবদন্তি প্রযোজক, পরিচালক, পরিবেশক এ কে এম জাহাঙ্গীর খান আর নেই। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। এ কে এম জাহাঙ্গীর খান ১৯৩৯ সালের ২১শে এপ্রিল কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবুল খায়ের মো. জাহাঙ্গীর খান। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৫৮ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর ১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে তিনি জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। ১৯৬৩ সালে জাপানে ফুজি কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে যোগ দেন।

এ কে এম জাহাঙ্গীর খান 'আলমগীর পিকচার্সের' ব্যানারে চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছেন। তিনি ৪৩টি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছিলেন। চলচ্চিত্র অঙ্গনে তিনি 'মুভি মোগল' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রযোজিত চলচ্চিত্রগুলো হলো– নয়নমণি, শুভদা, কি যে করি, সওদাগর, চন্দ্রনাথ, সূর্যকন্যা, সীমানা পেরিয়ে, আলিঙ্গন, তুফান, রঙিন রূপবান, বাদল, কুদরত, রাজ সিংহাসন, রঙিন কাঞ্চনমালা, আলী বাবা চল্লিশ চোর, আলতাবানু, ডিস্কো ড্যান্সার, পদ্মাবতী, সম্রাট, প্রেম দিওয়ানা ও বাবার আদেশসহ অসংখ্য ছবি রজতজয়ন্তী, সুবর্ণজয়ন্তী ও হীরকজয়ন্তী ছুঁয়েছে। স্বাধীন দেশে প্রথম যে ছবিটি টানা ১০৩ সপ্তাহ চলার রেকর্ড গড়েছিল সেটি হলো আমজাদ হোসেন পরিচালিত 'নয়নমণি'। ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ ছবিটি প্রায় এক কোটি টাকার ব্যবসা করে।

এ ছবির প্রযোজক ছিলেন তিনি। তাঁর প্রযোজিত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে নয়নমণি দুই বিভাগে, কি যে করি এক বিভাগে, সীমানা পেরিয়ে চার বিভাগে, চন্দ্রনাথ চার বিভাগে ও শুভদা তেরো বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়। ১৯৯৮ সালে তাঁর প্রযোজিত সর্বশেষ চলচ্চিত্র 'রঙিন নয়নমণি' মুক্তি পায়। মাঝে দীর্ঘদিন চলচ্চিত্র প্রযোজনা থেকে দূরে ছিলেন তিনি। প্রায় ২০ বছর পর আবার একসঙ্গে তিনটি চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেন তিনি। চলচ্চিত্রগুলো হলো– স্বাধীনতা, ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে ও রাধার মন এ সিনেমা তিনটির মহরত হয়েছিল গত অক্টোবরে। স্বাধীনতার পর যে কজন দাপুটে প্রযোজক বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্পকে এগিয়ে নিতে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম এ কে এম জাহাঙ্গীর খান। ১৯৭৮ সালে চিত্রালী সম্পাদক প্রয়াত আহমদ জামান চৌধুরী তাকে মুভি মোগল খেতাব দিয়েছিলেন। তখন থেকে তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি ঢাকার চলচ্চিত্র অঙ্গনে এ নামেই পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে জাহাঙ্গীর খানের অবদান অনেক।

তিনি চলচ্চিত্র প্রযোজনায় এসেছিলেন ১৯৭৩ সালে তাঁর বাবা মারা যাওয়ার পর। তবে তারও আগে থেকে তিনি সিনেমার পরিবেশক ছিলেন। বাবুল চৌধুরীর 'সেতু' চলচ্চিত্র দিয়ে ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করেন তিনি। মূলত 'মা' ছবি দিয়ে তাঁর প্রযোজনা শুরু হয়। ঢাকাই চলচ্চিত্রের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর নির্মাতা আবদুল জব্বার খানের দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি হৃদয়ের টান জাহাঙ্গীর খানকে মুগ্ধ করেছিল বলেই চলচ্চিত্রে নিজেকে যুক্ত করাটা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল বলে এক সাক্ষাৎকারে জানান তিনি। এছাড়া জাহাঙ্গীর খান বাংলাদেশের অনেক জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক প্রযোজনা করেছেন।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের এই গুণী মুভি মোগল জাহাঙ্গীর খান চলে যাওয়া মানে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি। যে ক্ষতি পূরণীয় নয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি এশার নামাজের পর মুগদাপাড়ায় স্থানীয় মসজিদে জানাজা শেষে সেখানকার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় তাঁকে। এর আগে মাগরিবের নামাজের পর গুলশানের ভোলা মসজিদে প্রথম জানাজা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 40, No. 09, March 2020, Tk. 25.00

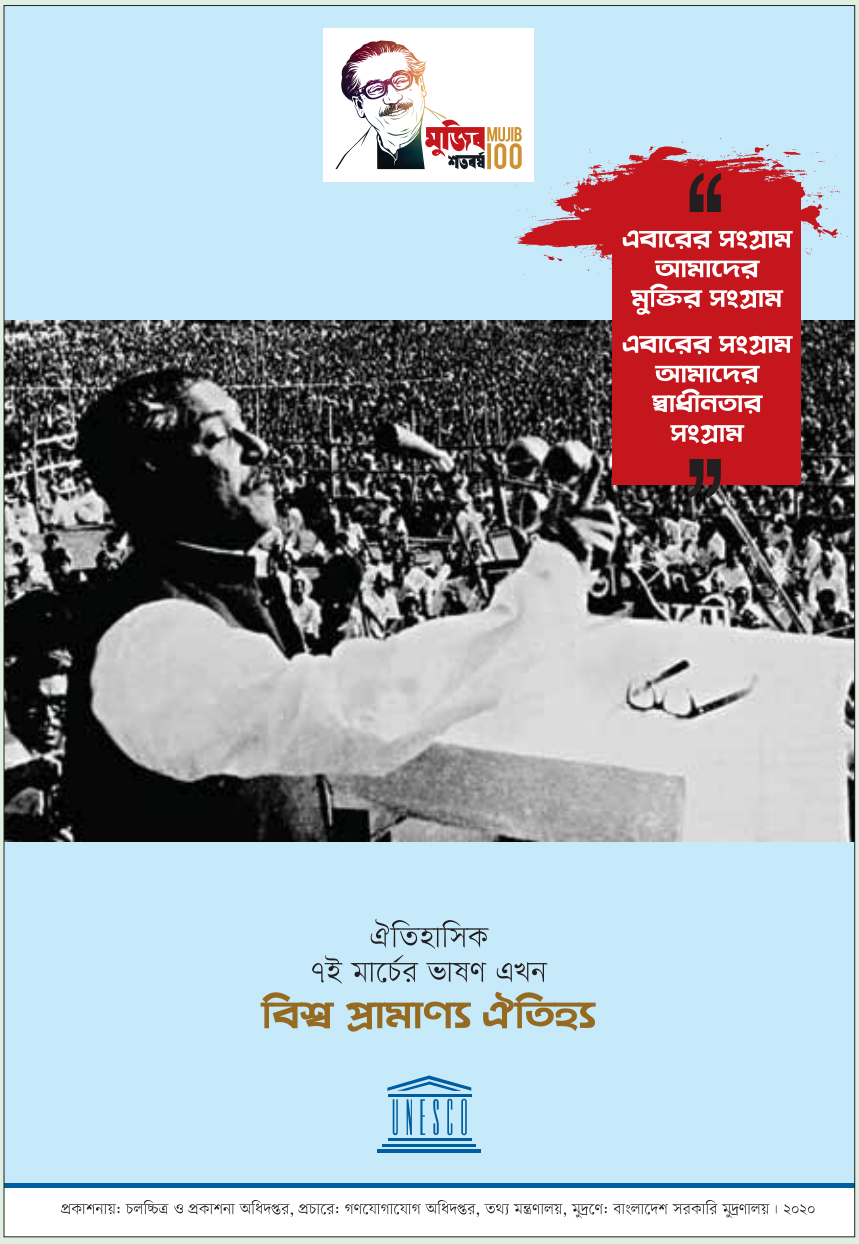

DFP
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd